এবারো বারো

সত্যজিৎ রায়

এবারো বারো

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ২ মে ১৯৬৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সত্যজিৎ রায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

সাধনবাবুর সন্দেহ ১
মানপত্র ৯
স্পটলাইট ১৬
ধাপ্পা ২৫
ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট ৩২
অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু ৪৩
অপদার্থ ৫৬
ফার্স্ট ক্লাস কামরা ৬২
গগন চৌধুরীর স্টুডিও ৭২
বহুরূপী ৮২
অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য ৯৫
জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা ১১৫

এবারো বারো

সাধনবাবুর সন্দেহ

সাধনবাবু একদিন সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ফিরে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলেন মেঝেতে একটা বিঘতখানেক লম্বা সরু গাছের ডাল পড়ে আছে। সাধনবাবু পিটপিটে স্বভাবের মানুষ। ঘরে যা সামান্য আসবাব আছে—খাট, আলমারি, আলনা, জলের কুঁজো রাখার টুল—তার কোনটাতে এক কণা ধুলো তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, ফুলকারি করা টেবিল ক্লথ—সবই তক্‌তকে হওয়া চাই। এতে ধোপার খরচটা বাড়ে, কিন্তু সেটা সাধনবাবু গা করেন না। আজ ঘরে ঢুকেই গাছের ডাল দেখে তাঁর নাক কুঁচকে গেল।

'পচা!'

চাকর পচা মনিবের ডাকে এসে হাজির।

'বাবু, ডাকছিলেন?'

'কেন, তোর কি সন্দেহ হচ্ছে?'

'না বাবু, তা হবে কেন?'

'মেঝেতে গাছের ডাল পড়ে কেন?'

'তা তো জানি না বাবু। কাক-চড়ুইয়ে এনে ফেলেছে বোধহয়।'

'কেন, ফেলবে কেন? কাক-চড়ুই ত ডাল আনবে বাসা বাঁধার জন্য। সে ডাল মাটিতে ফেলবে কেন? ঝাড়ু দেবার সময় লক্ষ করিসনি এটা? নাকি ঝাড়ুই দিসনি?'

'ঝাড়ু আমি রোজ দিই বাবু। যখন দিই তখন এ-ডাল ছিল না।'

'ঠিক বলছিস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।'

'তাজ্জব ব্যাপার তো!'

পরদিন সকালে আপিস যাবার আগে একটা চড়ুইকে তাঁর জানালায় বসতে দেখে সাধনবাবুর সন্দেহ হল ইনিই বাসা বাঁধার ফিকির খুঁজছেন। কিন্তু কোথায়? ঘরের মধ্যে জায়গা কোথায়? ঘুলঘুলিতে কি? তাই হবে।

তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সাতখানা ঘরের মধ্যে তাঁর ঘরের দিকেই চড়ুই-এর দৃষ্টি কেন এই নিয়েও সাধনবাবুর মনে খটকা লাগল। এমন কিছু আছে কি তাঁর ঘরে যা পাখিদের অ্যাট্র্যাক্ট করতে পারে?

অনেক ভেবে সাধনবাবুর সন্দেহ হল—ওই যে নতুন কবরেজী তেলটা তিনি ব্যবহার করছেন—যেটা দোতলার শখের কবিরাজ নীলমণিবাবুর মতে খুস্‌কির মহৌষধ—সেটার উগ্র গন্ধই হয়ত পাখিদের টেনে আনছে। সেই সঙ্গে এমনও সন্দেহ হল যে এটা হয়ত নীলমণিবাবুর ফিচলেমি. সাধনবাবুর ঘরটাকে একটা পক্ষিনিবাসে পরিণত করার মতলবে তিনি এই তেলের গুণগান করছেন।...

আসলে সতেরর-দুই মির্জাপুর স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটবাড়ির সকলেই সাধনবাবুর

সন্দেহ বাতিকের কথা জানেন, এবং আড়ালে এই নিয়ে হাসিঠাট্টা করেন। 'আজ কী কী সন্দেহের উদয় হল আপনার মনে?'—এ জাতীয় প্রশ্ন দিনের শেষে সাধনবাবুকে প্রায়ই শুনতে হয়।

শুধু প্রশ্ন নয়, অন্যভাবেও তাঁকে নিয়ে লেগ-পুলিং চলে। একতলার নবেন্দু চাটুজ্যের ঘরে সন্ধ্যায় তিন-তাসের আড্ডা বসে। সাধনবাবু তাতে নিয়মিত যোগদান করেন। সেদিন যেতে নবেন্দুবাবু তাঁকে একটা দলা পাকানো কাগজ দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন ত মশাই, এ থেকে কিছু সন্দেহ হয় কিনা। এটা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে।'

আসলে কাগজটা নবেন্দুবাবুরই মেয়ে মিনির অঙ্কের খাতার একটা ছেঁড়া পাতা। সাধনবাবু কাগজটাকে খুলে সেটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, 'এটা তো সংখ্যা দিয়ে লেখা কোনো সাংকেতিক ভাষা বলে মনে হচ্ছে।'

নবেন্দুবাবু কিছু না বলে চুপটি করে চেয়ে রইলেন সাধনবাবুর দিকে।

'কিন্তু এটার তো মানে করা দরকার,' বললেন সাধনবাবু। 'ধরুন এটা যদি কোনো হুমকি হয়, তাহলে...'

সংকেতের পাঠোদ্ধার হয়নি অবশ্য। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়; কথা হল, এই কাগজের দলা থেকে সাধনবাবুর সন্দেহ কোন কোন দিকে যেতে পারে সেইটে দেখা। সাধনবাবু বিশ্বাস করেন যে গোটা কলকাতা শহরটাই হল ঠক জুয়াচোর ফন্দিবাজ মিথ্যেবাদীর ডিপো। কারুর উপর ভরসা নেই, কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। এই অবস্থায় একমাত্র সন্দেহই মানুষকে সামলে চলতে সাহায্য করতে পারে।

এই সাধনবাবুই একদিন আপিস থেকে এসে ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিলের উপর একটা বেশ বড় চার-চৌকো কাগজের মোড়ক দেখতে পেলেন। তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হল সেটা ভুল করে তাঁর ঘরে চলে এসেছে। এহেন মোড়ক তাঁকে কে পাঠাবে? তিনি ত এমন কোনো পার্সেল প্রত্যাশা করেননি!

কাছে গিয়ে যখন দেখলেন যে মোড়কের উপর তাঁর নাম নেই, তখন সন্দেহটা আরো পাকা হল।

'এটা কে এনে রাখল রে?' চাকর পচাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন সাধনবাবু।

'আজ্ঞে একজন লোক ধনঞ্জয়ের হাতে দিয়ে গেছে দুপুরে এসে। আপনার নাম করে বলেছে আপনারই জিনিস।'

ধনঞ্জয় একতলার ষোড়শীবাবুর চাকর।

'কী আছে এতে, কে পাঠিয়েছে, সে সব কিছু বলেছে?'

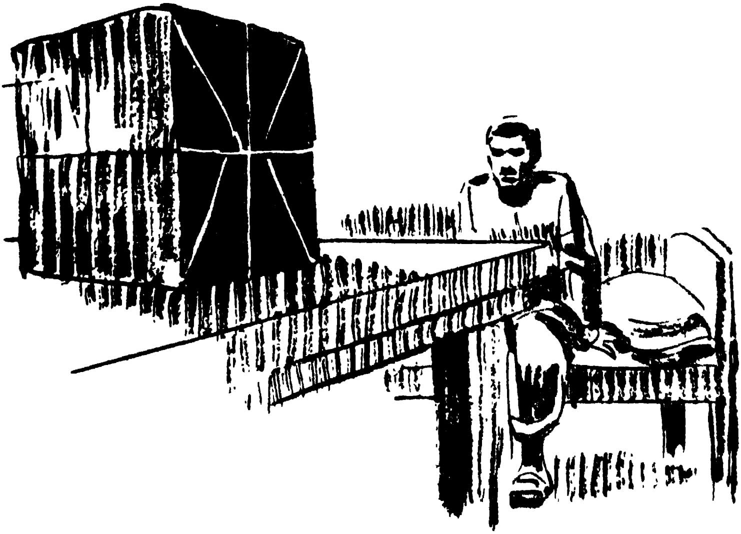
'আজ্ঞে তা ত বলেনি।'

'বোঝো!'

সাধনবাবু কাঁধের চাদরটা আলনায় রেখে খাটে বসলেন। রীতিমতো বড় মোড়ক। প্রায় একটা পাঁচ নম্বর ফুটবল ঢুকে যায় ভিতরে। অথচ কে পাঠিয়েছে জানার কোনো উপায় নেই।

সাধনবাবু খাট থেকে উঠে এগিয়ে গিয়ে মোড়কটা হাতে তুললেন। বেশ ভারী। কমপক্ষে পাঁচ কিলো।

সাধনবাবু মনে করতে চেষ্টা করলেন শেষ কবে তিনি এই জাতীয় মোড়ক পেয়েছেন। হ্যাঁ, বছর তিনেক আগে খড়দায় তাঁর এক মাসীমা থাকতেন, তিনি পাঠিয়েছিলেন আমসত্ত্ব। তার মাস ছয়েকের মধ্যেই সেই মাসীমার মৃত্যু হয়।



আজ সাধনবাবুর নিকট আত্মীয় বলতে আর কেউই অবশিষ্ট নেই। পার্সেল কেন, চিঠিও তিনি মাসে দু-একটার বেশি পান না। এই মোড়কের সঙ্গে একটা চিঠি থাকা অস্বাভাবিক হত না, কিন্তু তাও নেই।

কিম্বা হয়ত ছিল। সাধনবাবুর সন্দেহ হল ধনঞ্জয়ের অসাবধানতা হেতু সেটি খোয়া গেছে।

একবার ধনঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

তাকে ডেকে পাঠানো অনুচিত হবে মনে করে সাধনবাবু নিজেই নিচে গেলেন। ধনঞ্জয় উঠোনে বসে হামানদিস্তায় কী যেন ছেঁচছিল, সাধনবাবুর ডাকে উঠে এল।

'ইয়ে, আজ তোমার হাতে কেউ একটা পার্সেল দিয়ে গেসল আমার নাম করে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সঙ্গে চিঠি ছিল?'

'কই না ত।'

'কোত্থেকে আসছে সেটা বলেছিল?'

'মদন না কী জানি একটা নাম বললেন।'

'মদন?'

'তাইত বললেন।'

মদন নামে কাউকে চেনেন বলে মনে করতে পারলেন না সাধনবাবু। কী বলতে কী বলছে লোকটা কে জানে। ধনঞ্জয় যে একটি গবেট সে সন্দেহ অনেকদিনই করেছেন সাধনবাবু।

'চিঠিপত্তর কাগজটাগজ কিছু ছিল না সঙ্গে?'

'একটা কাগজ ছিল, তাতে বাবু সই করে দিলেন।'

'কে, ষোড়শীবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কিন্তু ষোড়শীবাবুকে জিগ্যেস করেও কোনো ফল হল না। একটা চিরকুটে তিনি সাধনবাবুর হয়ে সই করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেটা কোথা থেকে এসেছিল খেয়াল করেননি।

সাধনবাবু আবার নিজের ঘরে ফিরে এলেন। কার্তিক মাসের সন্ধ্যা, শীতটা এর মধ্যে বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। সামনে কালীপুজো, তার তোড়জোড় যে চলছে সেটা মাঝে মাঝে বোমা-পটকার—

'দুম্!'

পাড়াতেই একটা বোমা ফেটেছে। আর সেই মুহূর্তে খাটে বসা সাধনবাবুর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল।

টাইম-বোমা!

ওই মোড়কের মধ্যে টাইম-বোমা নেই ত, যেটা নির্দিষ্ট সময়ে ফেটে তাঁর ইহ-জগতের লীলা সাঙ্গ করে দেবে?

এই টাইম-বোমার কথা ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে। সারা বিশ্বের সন্ত্রাস-বাদীদের এটা একটা প্রধান অস্ত্র।

কিন্তু তাঁকে বোমা পাঠাবে কে, কেন?

প্রশ্নটা মনে আসতেই সাধনবাবু উপলব্ধি করলেন যে ব্যবসায়ী হওয়ার ফলে তাঁর শত্রুর অভাব নেই। কনট্র্যাক্ট পাবার জন্য তোষামোদ ধরাধরি তাঁকেও করতে হয়, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদেরও করতে হয়। যদি তিনি পেয়ে যান সে কনট্র্যাক্ট, তাহলে অন্যেরা হয়ে যায় তাঁর শত্রু। এ তো হামেশাই হচ্ছে।

'পচা!'

ডাকটা দিয়েই বুঝতে পারলেন যে তাঁর গলা দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোচ্ছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কিন্তু তাও পচা হাজির।

'বাবু, ডাকলেন?'

'ইয়ে—'

কিন্তু কাজটা কি ভালো হবে? সাধনবাবু ভেবেছিলেন পচাকে বলবেন পার্সেলে কান লাগিয়ে দেখতে টিক্‌টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা। টাইম-বোমার সঙ্গে কলকব্জা লাগানো থাকে, সেটা টিক্‌টিক্ শব্দে চলে। সেই টিক্‌টিক্-ই একটা পূর্বনির্ধারিত বিশেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পরিণত হয়।

পচা যখন কান লাগাবে, তখনই যদি বোমাটা--

সাধনবাবু আর ভাবতে পারলেন না। এদিকে পচা বাবুর আদেশের জন্য দাঁড়িয়ে আছে; সাধনবাবুকে বলতেই হল যে তিনি ভুল করে ডেকেছিলেন, তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই।

এই রাতটা সাধনবাবু ভুলবেন না কোনোদিন। অসুখ বিসুখে রাত্রে ঘুম হয় না এটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু চরম আতঙ্কে এই শীতকালে ঘর্মাক্ত অবস্থায় সারারাত ঠায় বিছানায় বসে কাটানোর অভিজ্ঞতা তাঁর এই প্রথম।

কিন্তু সকাল পর্যন্ত যখন বোমা ফাটল না, তখন কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে



সাধনবাবু স্থির করলেন যে আজই সন্ধ্যায় মোড়কটা খুলে দেখতে হবে তার মধ্যে কী আছে। তাঁর নিজেরও মনে হয়েছে যে তাঁর সন্দেহটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা এমন একটা ঘটনা ঘটল যে সাধনবাবুর আর মোড়ক খোলা হল না।

অনেক লোক আছে যারা খবরের কাগজের আদ্যোপান্ত না পড়ে পারে না। সাধনবাবু এই দলে পড়েন না। প্রথম এবং মাঝের পাতার খবরগুলোর শিরোনামায় চোখ বুলিয়েই তাঁর কাগজ পড়া হয়ে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই উত্তর কলকাতায় খুনের খবরটা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। আপিস থেকে ফিরে একতলায় নবেন্দু চাটুজ্যের ঘরে একটা বড় রকম দাপাদাপি চলছে শুনে কারণ জিগ্যেস করে তিনি ঘটনাটা জানতে পারলেন।

পটুয়াটোলা লেনে খুন, হত ব্যক্তির নাম শিবদাস মৌলিক। কথাটা শুনেই সাধনবাবুর একটা সুপ্ত স্মৃতি খোঁচা খেয়ে জেগে উঠল।

এক মৌলিককে তিনি চিনতেন খুব ভালো করে। তার প্রথম নাম শিবদাস কি? হতেও পারে। সাধনবাবু তখন থাকতেন ওই পটুয়াটোলা লেনেই। মৌলিক ছিল তাঁর প্রতিবেশী। তিন-তাসের আড্ডা বসত মৌলিকের ঘরে রোজ সন্ধ্যায়। মৌলিককে কেন জানি মৌলিক বলেই ডাকত সবাই। আরো দুজন ছিলেন আড্ডায়। সুখেন দত্ত আর মধুসূদন মাইতি। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটির মতো সাংঘাতিক চরিত্র সাধনবাবু আর দেখেননি। তাসের খেলায় সে যে জুয়াচুরির রাজা সে সন্দেহ সাধনবাবুর গোড়া থেকেই হয়েছিল। শেষে বাধ্য হয়ে একদিন সন্দেহটা প্রকাশ করতে হল। এতে মধু মাইতির প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভয়াবহ। তার পকেটে সব সময়ই যে একটি চাকু অবস্থান করে সেটা সেদিনই জানতে পেরে-

ছিলেন সাধনবাবু। তিনি প্রাণে বেঁচেছিলেন মৌলিক আর সুখেন দত্তর জন্য। ব্যবসায় উন্নতির পর সাধনবাবু পটুয়াটোলা লেনের খোলার ঘর ছেড়ে চলে আসেন মির্জাপুর স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটে। আর সেই থেকেই মৌলিক এণ্ড কোম্পানির সঙ্গে তাঁর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাসের নেশাটা তিনি ছাড়াতে পারেননি, আর সেই সঙ্গে তাঁর সন্দেহ বাতিকটাও। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে পরিবর্তন হয়েছিল বিস্তর। পোশাকে পারিপাট্য, বিড়ি ছেড়ে উইল্স সিগারেট ধরা, নীলামের দোকান থেকে মাঝে মাঝে শখের জিনিস কিনে এনে ঘর সাজানো—পেন্টিং, ফুলদানি, বাহারের অ্যাশট্রে—এ সবই গত পাঁচ-সাত বছরের ঘটনা।

এই খুনের ঘটনার শিবদাস মৌলিক যদি সেই মৌলিক হয়, তাহলে খুনী যে মধু মাইতি সে বিষয়ে সাধনবাবুর কোনো সন্দেহ নেই।

'খুনটা কী ভাবে হল?' সাধনবাবু জিগ্যেস করলেন।

'নৃশংস,' বললেন নবেন্দু চাটুজ্যে। 'লাশ সনাক্ত করার কোনো উপায় ছিল না। পকেটে একটা ডায়রি থেকে নাম জেনেছে।'

'কেন, কেন? সনাক্ত করার উপায় ছিল না কেন?'

'ধড় আছে, মুড়ো নেই। সনাক্ত করবে কি করে?'

'মুড়ো নেই মানে?'

'মুণ্ডু ঘ্যাচাং!' জোড়া হাত মাথার উপর তুলে আবার ঝটিতি নামিয়ে এনে খাঁড়ার কোপের অভিনয় করে বুঝিয়ে দিলেন নবেন্দু চাটুজ্যে। 'খুনী যে কোথায় সরিয়ে রেখেছে মুণ্ডু সেটা এখনো জানা যায়নি।'

'খুনী কে সেটা জানা গেছে?'

'তিন-তাসের বৈঠক বসত এই মৌলিকের ঘরে। তাদেরই একজন বলে সন্দেহ করছে পুলিশ।'

সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে উঠতে সাধনবাবু অনুভব করলেন যে তাঁর মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সেদিনের ঘটনা চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছেন তিনি—যেদিন তিনি মধু মাইতিকে জোচ্চুরির অপবাদ দিয়েছিলেন। চাকুর আক্রমণ থেকে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার বেশ কিছুক্ষণ পর অবধি মধু মাইতির দৃষ্টি তাঁর উপর অগ্নিবর্ষণ করেছিল সেটা মনে আছে। আর মনে আছে মধুর একটি উক্তি 'আমায় চেন না তুমি, সাধন মজুমদার!—আজ পার পেলে, কিন্তু এর বদলা আমি নোব, সে আজই হোক, আর দশ বছর পরেই হোক।'

রক্ত-জল-করা শাসানি। সাধনবাবু ভেবেছিলেন পটুয়াটোলা লেন থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন, কিন্তু—

কিন্তু ওই মোড়ক যদি মধু মাইতি দিয়ে গিয়ে থাকে? মদন!—ধনঞ্জয় বলেছিল মদন। ধনঞ্জয় যে কানে খাটো সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। মধু আর মদনে খুব বেশি পার্থক্য আছে কি? মোটেই না। মধু অথবা মধুর লোকই রেখে গেছে ওই পার্সেল, আর সেটা যাতে সত্যিই তাঁর হাতে পৌঁছায় তাই চিরকুটে সই করিয়ে নিয়েছে।

ওই মোড়কের ভিতরে রয়েছে শিবদাস মৌলিকের মাথা!

এই সন্দেহ সিঁড়ির মাথা থেকে তাঁর ঘরের দরজার দূরত্বটুকু পেরোবার মধ্যে দৃঢ় ভাবে সাধনবাবুর মনে গেঁথে গেল। দরজা থেকেই দেখা যায় টেবিলের উপর ফুলদানিটার পাশে রাখা মোড়কটাকে। মোড়কের ওজন এবং আয়তন দুইই এখন স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে তার ভিতরে কী আছে।

বাবু দোরগোড়ায় এসে থেমে গেছেন দেখে পচা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল; সাধনবাবু প্রচণ্ড মনের জোর প্রয়োগ করে বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে চাকরকে চা আনতে বললেন।

'আর, ইয়ে, আজ কেউ এসেছিল? আমার খোঁজ করতে?'

'কই না ত।'

'হুঁ।'

সাধনবাবু অবশ্য সন্দেহ করেছিলেন পুলিশ হয়ত এরই মধ্যে হানা দিয়ে গেছে। তাঁর ঘরে খুন হওয়া ব্যক্তির মুণ্ডু পেলে তাঁর যে কী দশা হবে সেটা ভাবতে তাঁর আরেক দফা ঘাম ছুটে গেল।

গরম চা পেটে পড়তে সামান্য বল যেন ফিরে এল মনে। যাক্—অন্তত টাইম বোমা ত নয়।

কিন্তু এও ঠিক যে এই মুণ্ডুসমেত মোড়কটিকে সামনে রেখে যদি তাঁকে সারা রাত জেগে বসে থাকতে হয় তাহলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

ঘুমের বড়িতে ঘুম হল ঠিকই, কিন্তু দুঃস্বপ্ন থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। একবার দেখলেন মুণ্ডুহীন মৌলিকের সঙ্গে বসে তিন-তাস খেলছেন তিনি, আরেকবার দেখলেন মৌলিকের ধড়বিহীন মুণ্ডু তাঁকে এসে বলছে, 'দাদা,—ওই বাক্সে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। দয়া করে মুক্তি দিন আমায়।'

বড়ি খাওয়া সত্ত্বেও চিরকালের অভ্যাস মতো সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল সাধনবাবুর। হয়ত ব্রাহ্ম মুহূর্তের গুণেই সংকট মোচনের একটা উপায় সাধনবাবুর মনে উদিত হল।

মুণ্ডু যখন তাঁর কাছে পাচার করা হয়েছে, তখন সে-মুণ্ডু অন্যত্র চালান দিতে বাধাটা কোথায়? তাঁর ঘর থেকে জিনিসটাকে বিদায় করতে পারলেই ত নিশ্চিন্তি।

ভোর থাকতেই অন্য কাজ সারার আগে বাজারের থলিতে মোড়কটা ভরে নিয়ে সাধনবাবু বেরিয়ে পড়লেন। প্যাকিংটা ভালোই হয়েছে বলতে হবে, কারণ ভিতরে রক্ত চুঁইয়ে থাকলেও তার বিন্দুমাত্র বাক্স ভেদ করে বাইরের কাগজে ছোপ ফেলেনি।

বাসে উঠে কালীঘাট পোঁছাতে লাগল পঁচিশ মিনিট। তারপর পায়ে হেঁটে আদিগঙ্গায় পোঁছে একটি অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে হাতের মোড়কটাকে সবেগে ছুঁড়ে ফেললেন নদীর মাঝখানে।

ঝপাৎ—ডুবুস্!

মোড়ক নিশ্চিহ্ন সাধনবাবু নিশ্চিন্ত।

-

বাড়ি ফিরতে লাগল পঁয়ত্রিশ মিনিট। সদর দরজা দিয়ে যখন ঢুকছেন তিনি, তখন ষোড়শীবাবুর দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজছে।

আর সেই ঘড়ির শব্দ শুনেই সাধনবাবু মুহূর্তে চোখে অন্ধকার দেখলেন।

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তাঁর। কদিন থেকেই বার বার সন্দেহ হয়েছে তিনি যেন কী একটা ভুলে যাচ্ছেন। পঞ্চাশের পর এ জিনিসটা হয়। একথা নীলমণিবাবুকে বলতে তিনি নিয়মিত ব্রাহ্মীশাক খেতে বলেছিলেন।

আজ আধ ঘণ্টা আগেই বেরিয়ে পড়তে হল সাধনবাবুকে, কারণ যাবার পথে একটা কাজ সেরে যেতে হবে।

রাসেল স্ট্রীটে নীলামের দোকান মডার্ন এক্সচেঞ্জে ঢুকতেই একগাল হেসে

এগিয়ে এলেন মালিক তুলসীবাবু।

'টেবিল ক্লকটা চলছে ত?'

'ওটা পাঠিয়েছিলেন আপনি?'

'বা রে, আমি ত বলেইছিলাম পাঠিয়ে দেব। সেটা পেঁছায়নি আপনার হাতে?'

'হ্যাঁ, মানে, ইয়ে—'

'আপনি পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে গেলেন, এত পছন্দ আপনার, আপনি পুরোন খদ্দের—কথা দিয়ে কথা রাখব না?'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই—'

'দেখবেন ফার্স্ট ক্লাস টাইম রাখবে ও ঘড়ি। নামকরা ফরাসী কোম্পানি তো! জিনিসটা জলের দরে পেয়ে গেছেন। ভেরি লাকি!'

তুলসীবাবু অন্য খদ্দেরের দিকে এগিয়ে যেতে সাধনবাবু দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। জলের দরের ঘড়ি জলেই গেল!

ভালো বদলা নিয়েছে মধু মাইতি তাতে সন্দেহ নেই। আর 'মডার্ন'কেই যে 'মদন' শুনেছে ধনঞ্জয় তাতেও কোনো সন্দেহ আছে কি?

মানপত্র

শতদল সংস্থার সেক্রেটারি প্রণবেশ দত্ত বিস্ফোরক সংবাদটি ঘোষণা করবার পর উপস্থিত সদস্যদের মুখ দিয়ে প্রায় এক মিনিট কোনো কথা বেরোল না। ক্লাব ঘরে জরুরী মিটিং বসেছে নববর্ষের পাঁচদিন আগে। মিটিং-এর উদ্দেশ্য প্রণবেশ জানায়নি কাউকে, কেবল বলেছে আজ সকলের আসা চাই-ই, কারণ সংকটময় মুহূর্ত সমুপস্থিত।

প্রথম মুখ খুলল জয়ন্ত সরকার।

'আর ইউ অ্যাবসোলিউটলি শিওর?'

জয়ন্ত লাগসই ইংরিজির হদিস পেলে বাংলা বলে না।

'বিশ্বাস না হয় চিঠি দেখ,' বলল প্রণবেশ। 'এই ত। সমরকুমারের নিজের সই। আরো শিওরিটির দরকার আছে কি?'

সমরকুমারের চিঠিটা হাত ঘুরে আবার প্রণবেশের কাছেই ফিরে এল। হ্যাঁ, সমরকুমারেরই সই বটে। ফিল্ম পত্রিকার দৌলতে এই সই কারুর চিনতে বাকি নেই—বিশেষ করে হ্রস্ব উ-এর ওই ডবল প্যাঁচ।

'কারণটা কী বলছে?' প্রশ্ন করল নরেন গুঁই।

'শুটিং,' বলল প্রণবেশ, 'হঠাৎ আউটডোর পড়ে গেছে কালিমপঙে। অতএব ভেরি সরি।'

'আশ্চর্য,' বলল শান্তনু রক্ষিত। 'লোকটা ইয়েস বলে স্রেফ নো করে দিল?'

নরেন গুঁই বলল, 'আমি ত গোড়াতেই বলেছিলাম—ওসব চিত্রতারকা-ফারকা বাদ দে। ওদের কথার কোনো ভ্যালু নেই।'

'হোয়াট এ ক্যাটাসট্রফি!' কপালের ঘাম মুছে বলল জয়ন্ত সরকার।

'এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা হয় না?' প্রশ্ন করল চুনিলাল সান্যাল। চুনিলাল স্থানীয় বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউটে বাংলার শিক্ষক।

'এই লাস্ট মোমেণ্টে আর কী বিকল্প ব্যবস্থা আশা করছ চুনিদা,' বলল সেক্রেটারি প্রণবেশ। 'আর আমি ত চুপচাপ বসে নেই। এর মধ্যে দুবার ট্রাঙ্ককল করেছি কলকাতায়। নিমুর সঙ্গে কথা হয়েছে। বললাম গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে খেলুড়ে যা হয় একটা ধর। সম্বর্ধনা অ্যানাউন্স করা হয়ে গেছে, মানপত্র লেখা হয়ে গেছে। সম্বর্ধনা আমাদের দশ বছরের ট্র্যাডিশন, ওটা ছাড়া ফাংশন হবে না। নিমু বললে, নো চান্স। এক কলকাতাতেই সাত-সাতটা সংস্থা সম্বর্ধনার আয়োজন করেছে। ক্যানডিডেটের চয়েস ত বেশি নেই। নামকরা যে কজন আছে সবাই এংগেজড্। পল্টু ব্যানার্জিকে ত একদিন দু-জায়গায় সম্বর্ধনা নিতে হচ্ছে; তাও একই শহরে বলে পারছে। শ্যামল সোম, রজত মান্না, হরবিলাস গুপ্ত, দেবরাজ সাহা—সব বেটাকে এক ধার থেকে কোনো-না-কোনো ক্লাব বুক করে রেখেছে।'

'তুমি যে মানপত্রের কথা বললে', বললেন ইন্দ্রনাথ রায়—যিনি এখানে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ—'সমরকুমারের জন্য যে মানপত্র লেখা হয়েছে সেটা তুমি অন্যের ঘাড়ে চাপাবে কি করে?'

'আপনি বোধহয় মানপত্রটা দেখেননি, ইন্দ্রদা,' বলল প্রণবেশ।

'না, দেখিনি।'

'তাই। ওর কোথাও ফিল্মস্টার বা ফিল্মের কোনো কথা নেই। অ্যাড্রেস করা হয়েছে "হে সুধী" বলে। সুধী ত এনিওয়ান হতে পারে।'

'দেখি মানপত্রটা।'

দেরাজ থেকে একটা পুরু পাকানো কাগজ বার করে সেটা ইন্দ্রনাথ রায়ের হাতে দিয়ে দিল প্রণবেশ।—'এটা লিখতে মনোতোষের ঝাড়া সাতদিন লেগেছে। ভাষাটা অবিশ্যি চুনিদার।'

চুনিলাল খুক্ করে একটা কাশি দিয়ে তার অস্তিত্বটা জানান দিল।

'"তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই"—একি, একি—এ যে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!'

পাকানো কাগজটা খুলে ধরেছেন ইন্দ্রনাথ। তাঁর কপালে খাঁজ, দৃষ্টি চুনিলালের দিকে।

'তা ত হবেই,' বলল চুনিলাল, 'রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে স্যার জগদীশ বোস কবিগুরুকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ভাষাটা শরৎচন্দ্রের। এটা তার প্রথম লাইন।'

'সে লাইন তুমি বেমালুম লাগিয়ে দিলে?'

'কোটেশনে আপত্তি কিসের ইন্দ্রদা? এ ত বিখ্যাত পংক্তি, শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই চিনবে। এর চেয়ে ভালো ধরতাই হয় না।'

'আর কটা কোটেশন আছে এতে?'

'আর নেই ইন্দ্রদা,' বলল চুনিলাল। 'বাকিটা সম্পূর্ণ মৌলিক।'

মানপত্র টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে একটা হাই তুলে ইন্দ্রনাথ বললেন, 'তাহলে বোঝ এখন তোমরা কী করবে।'

অক্ষয় বাগচীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, মেজাজও বেশ ভারিক্কি। তিনি একটা উইল্‌স ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'নামের মোহটা যদি ত্যাগ করতে পার ত আমি একজনের নাম সাজেস্ট করতে পারি। সম্বর্ধনা ছাড়া যখন ফাংশন হবে না, তখন তার কথাটা তোমরা ভেবে দেখতে পার।'

'নামের কথাটা যে এখন ভুলে যেতে হবে সে ত বুঝতেই পারছি', বলল প্রণবেশ। 'তবে তাই বলে ত আর রাস্তা থেকে লোক ডেকে রিসেপশন দেওয়া যায় না। কোনো একটা কনট্রিবিউশন ত থাকতে হবে লোকটার!'

'আছে', বললেন অক্ষয় বাগচী, 'এঁর আছে।'

'কার কথা বলছেন আপনি?' ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করল প্রণবেশ।

'হরলাল চক্রবর্তী।'

নামটা উচ্চারণ করার পরে ক্লাব ঘরে বেশ কয়েক মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য। উপস্থিত সভ্যদের অনেকেই যে এ নামটা শোনেনি সেটা বোঝা যাচ্ছে। কেবল ইন্দ্রনাথ রায় কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে থেকে অক্ষয় বাগচীর দিকে চেয়ে বললেন, 'হরলাল চক্রবর্তী মানে আর্টিস্ট হরলাল চক্রবর্তী?'

'হ্যাঁ, আর্টিস্ট,' মাথা নেড়ে বললেন অক্ষয় বাগচী। 'আমরা ছেলেবেলা থেকে

তাঁর আঁকা ছবি দেখে এসেছি গল্পের বইয়ে। বেশির ভাগ পৌরাণিক ছবি। এককালে খুব পপুলার ছিলেন। ছেলেদের পত্রিকাতেও ছবি আঁকতেন রেগুলারলি। আমার মনে হয় তেলা মাথায় তেল দেওয়ার চেয়ে এইটে অনেক ভালো হবে।'

'কথাটা মন্দ বলনি অক্ষয়', সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন ইন্দ্রনাথ। 'আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি। আমারও এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে তাঁর আঁকা ছবি। আমাদের বাড়িতে কাশীদাসের একটা এডিশন ছিল, তাতে তাঁরই আঁকা ছবি ছিল।'

'ভালো ছবি?' প্রশ্ন করল জয়ন্ত সরকার। 'মানে, যাকে দেওয়া হবে সম্বর্ধনা —ডাজ হি ডিজার্ভ ইট?'

এবার নরেন গুঁই নড়েচড়ে বসল।—'মনে পড়েছে। আমার বাড়িতে একটা হাতেমতাই ছিল। তার ছবিতে এইচ্ চক্রবর্তী সই ছিল। মনে পড়েছে।'

'এনি গুড?' জিগ্যেস করল জয়ন্ত সরকার।

'বটতলার বাবা।'

কথাটা বলে নরেন গুঁই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বয়োজ্যেষ্ঠদের দৃষ্টির আড়ালে সিগারেটে দুটো টান মেরে আসতে হবে।

'ছবি ভালো কি মন্দ সেটা বড় কথা নয়,' বললেন ইন্দ্রনাথ রায়। 'লোকটা একটানা বহুকাল ধরে কাজ করে গেছে। অক্লান্ত কর্মী। চাহিদা যখন ছিল তখন নিশ্চয়ই পপুলারিটি ছিল। অথচ বাগচী যেটা বলল, যাকে বলে রেকগনিশন, সে জিনিস সে নিশ্চয় পায়নি! সেটা শতদল সংস্থা তাকে দেবে।'

'আর সবচেয়ে বড় কথা,' বললেন অক্ষয় বাগচী, 'আর সুবিধের কথা—সে এই শহরেরই লোক। তার জন্য কলকাতা ছুটোছুটি করতে হবে না।'

'আরেব্বাস,' বলল প্রণবেশ, 'এটা ত জানা ছিল না!'

তথ্যটা উপস্থিত সকলের কাছেই নতুন বলে ক্লাব ঘরে একটা গুঞ্জন সুরু হয়ে গেছে।

'কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন...?' প্রণবেশ অক্ষয় বাগচীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিল।

'আমি জানি,' বললেন বাগচী। 'কুমোরপাড়ার শেষ মাথায় যেখানে রাস্তা দুভাগ হয়ে গেছে, সেটা ধরে বাঁয়ে কিছুদূর গেলেই মন্মথ ডাক্তারের বাড়ি। তিনি একবার বলেছিলেন হরলাল চক্রবর্তী তাঁর প্রতিবেশী।'

'আপনি তাঁকে চেনেন? হরলালকে?'

'চিনি মানে, বছর পাঁচেক আগে একবার মুখুজ্যেদের বাড়িতে দেখেছিলাম। এক ঝলকের দেখা আর কি। বোধহয় ওদের বাড়ির জন্য কিছু ছবি আঁকছিলেন।'

'কিন্তু'—প্রণবেশের মনে এখনো খট্কা।

'কিন্তু কী?' জিগ্যেস করলেন ইন্দ্রনাথ রায়।

'না, মানে, নামটা ত অ্যানাউন্স করতে হবে যদি উনি রাজি হন সম্বর্ধনা নিতে।'

'তাতে কী হল?'

'লোকে যদি সে-নাম না শুনে থাকে, তাহলে...'

'তাহলে ভাববে এ আবার কাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে—তাই ত?'

'হ্যাঁ, মানে—'

'কিছু না। নামের আগে জুড়ে দেবে "প্রখ্যাত প্রবীণ চিত্রশিল্পী"—ব্যস্। যারা তাঁর নাম জানে না তারা জানুক। এটাও ত শতদল সংস্থার একটা দায়িত্ব, নয় কি?'

'রেস্‌কিউইং ফ্রম ওবলিভিয়ন,' বললে জয়ন্ত সরকার। 'ভেরি গুড আইডিয়া।'

আইডিয়াটা যে ভেরি গুড সেটা মোটামুটি সকলেই মেনে নিল। উৎসাহের নিভু-নিভু আগুন ইন্ধন পেয়ে আবার হল্‌কে উঠল। সকলেই স্বীকার করল যে এতে শতদল সংস্থার প্রেস্টিজ বাড়বে বই কমবে না। তারা যেটা করতে চলেছে সেটা মামুলি সম্বর্ধনা নয়, সেটা একটা সামাজিক কর্তব্যও বটে! হয়ত এটাই হবে ভবিষ্যতের রেওয়াজ। বাঙলার যেসব কৃতী সন্তান অন্ধকারে পড়ে আছেন তাঁদের আলোতে তুলে ধরা।

ঠিক হল অক্ষয় বাগচী নিজে যাবেন প্রণবেশ ও ক্লাবের আরেকটি সভ্যকে নিয়ে হরলাল চক্রবর্তীর বাড়ি। কাল সকালেই যাওয়া দরকার, কারণ আর সময় নেই। চক্রবর্তী মশাই রাজি হলে, ক্লাবের প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে পোস্টারে সমর-কুমারের জায়গায় নতুন নামটা বসিয়ে দিতে হবে। নামের আগে অবিশ্যি 'প্রখ্যাত প্রবীণ চিত্রশিল্পী' কথাটা বাদ দিলে চলবে না।

গোলাপী রঙের একতলা বাড়ির ফটকে 'হরলাল চক্রবর্তী, আর্টিস্ট' ফলক থাকায় কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল। অক্ষয় বাগচী ভুল বলেননি; এই বাড়ির দুটো বাড়ি পরেই মন্মথ ডাক্তারের বাসস্থান। প্রণবেশ ও বাগচীমশাই ছাড়া সঙ্গে এসেছেন বাংলার শিক্ষক চুনিলাল সান্যাল।

তিনজনে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা ফুলের বাগান, তাতে একটা আমড়া গাছ। পরিবেশ ছিমছাম হলেও সচ্ছলতার কোনো পরিচয় নেই। বোঝাই যাচ্ছে হরলাল চক্রবর্তীর ভাগ্যে যে শুধু খ্যাতিই জোটেনি তা নয়, অর্থোপার্জনের ব্যাপারেও তিনি তেমন সুবিধে করতে পারেননি।

দরজায় টোকা দেবার আর দরকার হল না, কারণ পক্ক গুম্ফবিশিষ্ট চশমা-পরিহিত এক ভদ্রলোক, হয়ত জানালা দিয়ে আগন্তুকদের দেখেই, দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। পরনে লুঙ্গি করে পরা ধুতির উপর লম্বাহাতা জালিদার গেঞ্জি।

অক্ষয় বাগচী নমস্কার করে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনার বোধহয় মনে নেই, বছর পাঁচ-সাত আগে ধরণী মুখুজ্যের বাড়িতে একবার আপনার সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছিল।'

'ও—'

'একটা ইয়ে, মানে, কথা ছিল আপনার সঙ্গে,' বলল প্রণবেশ। 'একটু বসা যায় কি?'

'আসুন না।'

দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁয়ে বৈঠকখানা। কিছু বাঁধানো পেন্টিং, তাতে ইংরিজিতে এইচ্ চক্রবর্তী সই সুস্পষ্ট। এ ছাড়া অনাড়ম্বর পরিবেশ। তক্তপোষ ও কাঠের চেয়ার মিলিয়ে সকলেরই বসার জায়গা হয়ে গেল।

'আমরা আসছি শতদল সংস্থার পক্ষ থেকে,' বলল প্রণবেশ।

'শতদল সংস্থা?'



'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা ক্লাব। এখানের খুব নামকরা ক্লাব। বরদাবাবু—বরদা মজুমদার এম, এল, এ—আমাদের প্রেসিডেন্ট।'

'ও।'

'আমরা প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ একটা ফাংশন করি। একটু গান-বাজনা হয়, একটা একাঙ্ক নাটিকা, আর তার সঙ্গে, বাংলার সংস্কৃতির ব্যাপারে যাঁর কিছু অবদান আছে এমন একজনকে আমরা সম্বর্ধনা দিই। এবার আপনার কথাটাই মনে পড়ল। আপনি আমাদের শহরের লোক, অথচ, মানে, তেমন করে ত কেউ আপনাকে চেনে না...'

'হুঁ—। পয়লা বৈশাখ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সে ত আর মাত্র চারদিন।'

'হ্যাঁ। মানে, একটু লেট হয়ে গেল। কতকগুলো—' প্রণবেশ গলা খাঁক্‌রে নিল—'অসুবিধা ছিল।'

'বুঝলাম। তা, সম্বর্ধনা মানে...?'

'কিছুই না। ছ'টা নাগাদ আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব গাড়িতে করে। সন্ধ্যা ছ'টা। আপনার আইটেমটা একদম শেষে। আপনাকে একটা মানপত্র দেওয়া হবে, ইনি—মিস্টার বাগচী—আপনার সম্বন্ধে দুটো কথা বলবেন, আর শেষে আপনিও যদি দুকথা বলেন তাহলে ত কথাই নেই। ন'টার মধ্যে ফাংশন শেষ।'

'হুঁ—।'

'আপনার বাড়ির লোক, মানে, আপনার স্ত্রী...'

'উনি ত বাতের রুগী।'

'ও। তা আপনি যদি আর কাউকে নিয়ে যেতে চান. '

'সেটা দেখা যাবে 'খন।'

এবার অক্ষয় বাগচী একটা কাজের কথা পাড়লেন।

'আপনার সম্বন্ধে একটা ইনট্রোডাকশন দিতে পারলে ভালো হত।'

'ঠিক আছে। আমি কিছু তথ্য লিখে রাখব একটা কাগজে। আপনারা কাল যদি কাউকে পাঠিয়ে দেন—'

'আমি নিজেই এসে নিয়ে যাব,' বলল প্রণবেশ।

শতদল সংস্থার তিন সদস্য উঠে পড়লেন। হরলাল চক্রবর্তী যেন এতক্ষণে ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছেন। তাঁর চোখের কোণ চিক্‌চিক্‌ করছে বলে মনে হল প্রণবেশের।

অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যে সুনাম আছে শতদল সংস্থার, এই পয়লা বৈশাখেও সেটা অক্ষুণ্ণ রইল। হরলাল চক্রবর্তীর নাম শুনে 'ইনি আবার কিনি' বলে যে প্রশ্ন উঠেছিল, সম্বর্ধনার পরে সে প্রশ্ন আর কেউ করেনি। সরকারী আর্ট স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবন, পেশাদারী শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর অক্লান্ত স্ট্রাগল, পৌরাণিকী সিরিজের ছাপ্পান্নখানা বই ও অজস্র শিশু পত্রিকার পাতায় তাঁর ছবি, রায়বাহাদুর এল. কে গুপ্তর প্রশংসাপত্র, বর্ধমান মহারাজাধিরাজ কর্তৃক প্রদত্ত রৌপ্য পদক এবং সবশেষে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে আরথ্রাইটিস রোগের আক্রমণ হেতু বাষট্টি বছর বয়সে চিত্রাঙ্কন থেকে অবসর গ্রহণ —এসবই তথ্য আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই অবগত হলেন। হরলাল নিজে শতদল সংস্থার উদ্যমের প্রশংসা করে শুধু একটি কথাই বললেন—'এই প্রশংসাপত্র আমার প্রাপ্য নয়।' তাঁর বিনয়সূচক এই উক্তি অবিশ্যি সকলের মনেই গভীরভাবে রেখাপাত করল।

পুষ্পমাল্য ও ফ্রেমে বাঁধানো মানপত্র নিয়ে হরলাল যখন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট নীহার চৌধুরীর গাড়িতে উঠছেন তখন তিনি বেশি খুশি না শতদল সংস্থার সভ্যরা বেশি খুশি তা বলা শক্ত। শেষ কথা বললেন ইন্দ্রনাথ রায়, 'আগামী বছরের সম্বর্ধনা তোমরা বাগচীকেই দিও, প্রণবেশ ভায়া। সেই ত ক্লাবের মানটা বাঁচালো!'

পরদিন সকালে সংস্থার আপিসে একটি লোক এসে সেক্রেটারির নামে একটি মোড়ক দিয়ে গেল। প্রণবেশ মোড়কটা খুলে ভারী অবাক হয়ে দেখল তাতে রয়েছে হরলাল চক্রবর্তীর মানপত্র। সঙ্গের চিঠি রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে মনে করে সেটি খুলে প্রণবেশ যা পড়ল তা হল এই—

শতদল সংস্থার সেক্রেটারি মহাশয় সমীপে সবিনয় নিবেদন—

সেদিন আপনাদের কথায় মনে হয়েছিল আপনারা নেহাৎ বিপাকে পড়ে হরলাল চক্রবর্তীকে সম্বর্ধনা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনাদের ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করতে পেরে আমি পুলক বোধ করছি। তবে মানপত্রটি ফেরত দিতে বাধ্য হলাম। তার কারণ, প্রথমত, পড়ে দেখলাম যে নাম ও তারিখ বদল

করে এটি আপনারা স্বচ্ছন্দে আগামী বছর কাজে লাগাতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, এই মানপত্র সত্যিই আমার প্রাপ্য নয়। চিত্রশিল্পী হরলাল চক্রবর্তী আজ তিন বছর হল এই শহরেই দেহরক্ষা করেছেন। তিনি ছিলেন আমার দাদা। আমি কাঁথিতে পোস্টাপিসের সামান্য কর্মচারী। এখানে এসেছিলাম সাতদিনের ছুটিতে।

ইতি ভবদীয়
রসিকলাল চক্রবর্তী

স্পটলাইট

ছোটনাগপুরের এই ছোট্ট শহরটায় পুজোর ছুটি কাটাতে আমরা আগেও অনেক-বার এসেছি। আরো বাঙালীরা আসে; কেউ কেউ নিজেদের বাড়িতে থাকে, কেউ কেউ বাড়ি-বাংলো-হোটেল ভাড়া করে থাকে, দিন দশেকে অন্তত মাস ছয়েক আয়ু বাড়িয়ে নিয়ে আবার যে-যার জায়গায় ফিরে যায়। বাবা বলেন, 'আজকাল আর খাবার-দাবার আগেব মতো সস্তা নেই ঠিকই, কিন্তু জলবায়ুটা ত ফ্রী, আরে সেটার কোয়ালিটি যে পড়ে গেছে সে কথা ত কেউ বলতে পারবে না।'

দলে ভারী হয়ে আসি, তাই গাড়ি-ঘোড়া সিনেমা-থিয়েটার দোকান-পাট না থাকলেও দশটা দিন দারুণ ফুর্তিতে কেটে যায়। একটা বছরের ছুটির সঙ্গে আরেকটা বছরের ছুটির তফাত কী জিগ্যেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে, কারণ চারবেলা খাওয়া এক—সেই মুরগী মাংস ডিম অড়হর ডাল, বাড়িতে দোওয়া গরুর দুধ, বাড়ির গাছের জামরুল পেয়ারা; দিনের রুটিন এক—রাত দশটায় ঘুম, ভোর ছটায় ওঠা, দুপুরে তাস মোনপলি, বিকেলে চায়ের পর রাজা পাহাড় অবধি ইভনিং ওয়ক্; অন্তত একদিন কালীঝোরার ধারে পিকনিক; দিনে ঝলমলে রোদ আর তুলো পেঁজা মেঘ; রাত্তিরের আকাশের এমাথা থেকে ওমাথা ছড়ানো ছায়াপথ, কাক শালিক কাঠবেড়াল গুবরে ভোমরা গিরগিটি কাঁচপোকা কুঁচফল—সব এক।

কিন্তু এবার নয়।

এবার একটা তফাত হল।

অংশুমান চ্যাটার্জিকে আমার তেমন ভালো না লাগলে কী হল—সে হচ্ছে পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে জনপ্রিয় ফিল্মস্টার। আমার ছোট বোন শর্মি—বারো বছর বয়স—তার একটা পুরো বড় বঙ্গলিপি খাতা ভরিয়ে ফেলেছে ফিল্ম পত্রিকা থেকে কাটা অংশুমান চ্যাটার্জির ছবি দিয়ে। আমার ক্লাসের ছেলে-দের মধ্যেও তার 'ফ্যান'-এর অভাব নেই। এর মধ্যেই তারা অংশুমানের চুলের স্টাইল নকল করছে, ওর মতো ভাবী গলায় ভুরু তুলে কথা বলার চেষ্টা করে, শার্টের নিচে গেঞ্জি পরে না, ওপরের তিনটে বোতাম খোলা রাখে।

সেই অংশুমান চ্যাটার্জি সঙ্গে তিনজন চামচা নিয়ে কুণ্ডুদের বাড়ি ভাড়া করে ছুটি কাটাতে এসেছে এই শহরে, সঙ্গে পোলারাইজড কাঁচের জানালাওয়ালা এয়ার কন্ডিশনড হলদে মার্সেডিজ গাড়ি। সেবার আন্দামান যাবার সময় দেখে-ছিলাম আমাদের জাহাজ ঢেউ তুলে চলেছে আর আশেপাশের ছোট নৌকাগুলো সেই ঢেউয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে। অংশুমান-জাহাজ বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোলে এখানকার পান্‌সে-নৌকো বাঙালী চেঞ্জারদের সেই রকম অবস্থা হয়—ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ কেউ বাদ যায় না। মোটকথা এই একরত্তি শহরে এরকম

ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। ছোটমামা ছবি-টবি দেখেন না। শখ হল পার্মিস্টার, তিনি বললেন, 'ছেলেটার যশের রেখাটা একবার দেখে আসতে হচ্ছে। এ সুযোগ কলকাতায় আসবে না।' মা-র অবিশ্যি ইচ্ছে অংশুমানকে একদিন ডেকে খাওয়ানোর। শর্মিকে বললেন, 'হাঁরে, তোরা ত ফিলিমের ম্যাগাজিনে ওর বিষয় এত সব পড়িস-টড়িস—ও কী খেতে ভালোবাসে জানিস?' শর্মি মুখস্থ আউড়ে গেল—'কৈ মাছ, সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ মাছ, কাঁচ পাঠার ঝোল, তন্দুরি চিকেন, মুসুরির ডাল, আমের মোরব্বা, ভাপা দই—তবে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে চাইনীজ।' মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাবা বললেন, 'খেতে বলতে ত আপত্তি নেই। হয়ত বললে আসবেও, তবে সঙ্গের ওই মোসাহেবগুলো...'

ফেনিদা আমার খুড়তুতো ভাই। সে সাংবাদিক, খবরের কাগজের আপিসে কাজ করে, ছুটি প্রায় পায় না বললেই চলে। এবার এসেছে ঝিকুড়িতে সাঁওতালদের একটা পরব হয় এই সময়, সেই নিয়ে একটা ফীচার লিখতে। সে বলল এই ফাঁকে অংশুমানের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের সুযোগ তাকে নিতেই হবে। 'লোকটা বছরে তিনশো সাতষট্টি দিন শুটিং করে; ছুটির মওকা কি করে পেল সেটাই ত একটা স্টোরি।'

একমাত্র ছোটদারই কোনো তাপ উত্তাপ নেই। ও প্রেসিডেন্সিতে পড়া ভয়ংকর সিরিয়াস ছেলে। ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার, জার্মান সুইডিশ ফরাসী কিউবান ব্রেজিলিয়ান ছবি দেখে, বাংলা ছবি নিয়ে একটা কড়া থীসিস লিখবে বলে ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা করছে। অংশুমানের 'বিনিদ্র রজনী' ছবি টেলিভিশনে তিন মিনিট দেখে 'ডিসগাসটিং' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে মনে হয় এবারের ছুটিটাই মাটি; ফিল্ম স্টার এসে এমন সুন্দর চেঞ্জের জায়গার আবহাওয়াটা নষ্টই করে দিয়েছে।

যারা চেঞ্জে আসে তারা ছাড়াও বাঙালী এখানে দু'চার জন আছে যাঁরা এখানেই থাকেন। তার মধ্যে গোপেনবাবু একজন। একটা ছোট্ট বাড়ি করে আছেন এখানে বাইশ বছর, চাষের জমিও নাকি আছে কিছু। বয়স বোধ হয় বাবার চেয়ে বছর পাঁচেকের বেশি, রসিক মানুষ, উনি এলেই মনটা খুশি-খুশি হয়ে যায়।

আমরা পেঁছানর দুদিন পরেই ভদ্রলোক সকালে এসে হাজির, খদ্দরের পাঞ্জাবীর সঙ্গে মালকোঁচা-মারা ধুতি, হাতে বাঁকানো লাঠি আর পায়ে ব্রাউন কেডস জুতো। বাংলোর বাইরে থেকেই হাঁক দিলেন ভদ্রলোক—'চৌধুরী সাহেব আছেন নাকি?'

আমরা চা খাচ্ছিলাম, বাবা ভদ্রলোককে ডেকে এনে বসালেন আমাদের সঙ্গে।

'ওরে বাবা, এ যে দেখছি এলাহি কারবার!' বললেন ভদ্রলোক। 'আমি কিন্তু শুধু এক কাপ চা।'

গতবারে ভদ্রলোকের চোখে ছানি ছিল, বললেন মার্চ মাসে কলকাতায় গিয়ে কাটিয়ে এসেছেন।—'দিব্যি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

'এবার ত এখানে রমরমা ব্যাপার মশাই,' বললেন বাবা।

'কেন?' ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেছে।

বাবা বললেন, 'সে কি মশাই, তারার হাট বসে গেছে এখানে, আর আপনি জানেন না?'

'তার মানে আপনার দৃষ্টি এখনো ফরসা হয়নি,' বললেন ছোটমামা, 'এত বড়

ফিল্ম স্টার এসে রয়েছে এখানে, শহরে হৈ হৈ পড়ে গেছে, আর আপনি সে খবর রাখেন না?'

'ফিল্ম স্টার?' গোপেনবাবুর ভুরু এখনো কুঁচকোন। 'ফিল্ম স্টার নিয়ে এত মাতামাতি করার কী আছে মশাই? ফিল্ম স্টার মানে ত শুটিং স্টার। তারা ত শুটিং করে শুনেছি। শুটিং স্টার জান ত, সুমোহন?' আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন গোপেনবাবু—'আজকে আছে, কালকে নেই। ফস্ করে খসে পড়বে আকাশ থেকে আর বায়ুমণ্ডলে যেই প্রবেশ করল অমনি পুড়ে ছাই। তখন পাত্তাই পাওয়া যাবে না তার।'

ছোটদার একটা ছোট্ট চাপা কাশিতে বুঝলাম গোপেনবাবুর কথাটা তার মনে ধরেছে।

'আসল স্টারের খবরটা' তাহলে পেঁছিয়নি আপনাদের কাছে?' গরম চায়ে চুমুক দিয়ে জিগ্যেস করলেন গোপেনবাবু।

'আসল স্টার?'

প্রশ্নটা করলেন বাবা, কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি গোপেনবাবুর দিকে, সকলেরই মনে এক প্রশ্ন।

'গির্জার পিছনদিকে কলুটোলার চাটুজ্যেদের একটা বাগানওয়ালা একতলা বাড়ি আছে দেখেছেন ত? সেইখেনে এসে রয়েছেন ভদ্রলোক। নাম বোধ হয় কালিদাস বা কালীপ্রসাদ বা ওইরকম একটা কিছু। পদবী ঘোষাল।'

'স্টার বলছেন কেন?' বাবা জিগ্যেস করলেন।

'বলব না?' একেবারে পোল স্টার। স্টেডি। ইটারন্যাল। একশোর ওপব বয়স, কিন্তু দেখে বোঝার জো নেই।'

'বলেন কি! সেঞ্চুরিয়ন?' মামার হাঁয়ের মধ্যে চিবোন টোস্টের অনেকটা এখনো গেলা হয়নি।

'সেঞ্চুরি প্লাস টোয়েনটি-সিক্স। একশো ছাব্বিশ বছর বয়স ভদ্রলোকের। জন্ম এইটিন-ফিফটিসিক্স। সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক এক বছর আগে। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন এইটিন সিক্সটি-ওয়ান।'

আমাদের কথা বন্ধ, খাওয়া বন্ধ। গোপেনবাবু আবার চুমুক দিলেন চায়ে।

প্রায় এক মিনিট কথা বন্ধের পর ছোটদা প্রশ্ন করল, 'বয়সটা আপনি জানলেন কি করে? উনি নিজেই বলেছেন?'

'নিজে কি আর যেচে বলেছেন? অতি অমায়িক ভদ্রলোক। নিজে বলার লোকই নন। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল। দেখে মনে হবে আশি-বিরাশি। ওঁরই বাড়ির বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। একবার পর্দার ফাঁক দিয়ে এক মহিলাকে দেখলুম, পাকা চুল, চোখে সোনার চশমা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। কথাচ্ছলে শুধোলুম—"আপনার গিন্নীর এখানকার ক্লাইমেট সুট করছে ত?" ভদ্রলোক স্মিতহাস্য করে বললেন, "গিন্নী নয়, নাতবৌ।" আমি ত থ। বললুম, "কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনার বয়সটা—?" "কত মনে হয়?" জিগ্যেস করলেন ভদ্রলোক। বললুম, "দেখে ত মনে হয় আশি-টাশি।" আবার সেই মোলায়েম হাসি হেসে বললেন, "অ্যাড অ্যানাদার ফর্টি-সিক্স।" বুঝুন তাহলে। সোজা হিসেব।

এর পর ব্রেকফাস্টটা ঠিকমতো খাওয়া হল না। এমন খবরে খিদে মরে যায়। ভারতবর্ষের—না, শুধু ভারতবর্ষ কেন—খুব সম্ভবত সারা পৃথিবীর মধ্যে সব

চেয়ে দীর্ঘায়ু লোক এখানে এসে রয়েছেন, আমরা যখন রয়েছি তখনই রয়েছেন, এটা ভাবতে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

'দেখে আসুন গিয়ে', বললেন গোপেনবাবু। 'এমন খবর ত চেপে রাখা যায় না, তাই বললুম দু'চার জনকে —সুধীরবাবুদের, সেন সাহেবকে, বালিগঞ্জ পার্কের মিঃ নেওটিয়াকে। সবাই গিয়ে দর্শন করে এসেছেন। আর দুটো দিন যাক না, দেখুন কী হয়। আসল স্টারের অ্যাট্রাকশনটা কোথায় সেটা বুঝতে পারবেন।'

'লোকটির স্বাস্থ্য কেমন?' মামা জিগ্যেস করলেন।

'সকাল বিকেল ডেইলি দুমাইল।'

'হাঁটেন!'

'হাঁটেন। লাঠি একটা নেন হাতে। তবে সে ত আমিও নিই। ভেবে দেখুন, আমার দ্বিগুণ বয়স!'

'ভদ্রলোকের আয়ুরেখাটা..'

মামার ওয়ান-ট্র্যাক মাইন্ড।

'দেখবেন হাত', বললেন গোপেনবাবু, 'বললেই দেখাবেন।'

ছেনিদা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, হঠাৎ টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল।—'স্টোরি। এর চেয়ে ভালো স্টোরি হয় না। এ একেবারে স্কুপ।'

'তুই কি এখনই যাবি নাকি?' প্রশ্ন করলেন বাবা।

'একশো-ছাব্বিশ বয়স', বলল ছেনিদা। 'এরা কিভাবে মরে জান ত? এই আছে, এই নেই। ব্যারাম-ট্যারামের দরকার হয় না। সুতরাং, সাক্ষাৎকার যদি নিতে হয় ত এই বেলা। পরে দর্শনের হিড়িক পড়ে গেলে আর চান্স পাবো?'

'বোস্!' বাবা একটু ধমকের সুরেই বললেন। 'সবাই একসংগে যাব। তোর ত একার প্রশ্ন নেই, আমাদের সকলেরই আছে। খাতা নিয়ে যাস, নোট করে নিবি।'

'বোগাস।'

কথাটা বলল ছোটদা। আর বলেই আবার দ্বিতীয়বার জোরের সংগে বলল, 'বোগাস! ধাপ্পা। গুল।'

'মানে?' গোপেনবাবুর মোটেই পছন্দ হয়নি কথাগুলো। 'দ্যাখো সুরঞ্জন, শেকসপীয়র পড়েছ ত? দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভ্‌ন অ্যান্ড আর্থ জানা আছে ত? সব ব্যাপার বোগাস বলে উড়িয়ে দিলে চলে না।'

ছোটদা গলা খাক্‌রে নিল।

'আপনাকে একটা কথা বলছি গোপেনবাবু—আজকাল প্রমাণ হয়ে গেছে যে যারা একশো বছরের বেশি বয়স বলে ক্লেম করে তারা হয় মিথ্যেবাদী না হয় জংলী ভূত। রাশিয়ার হাই অলটিচিউডে একটা গ্রামে শোনা গিয়েছিল মেজরিটি নাকি একশোর বেশি বয়স, আর তারা এখনো ঘোড়া-টোড়া চড়ে। এই নিয়ে ইনভেসটিগেশন হয়। দেখা যায় এরা সব একেবারে প্রিমিটিভ। তাদের জন্মের কোনো রেকর্ডই নেই। পুরোন কথা জিগ্যেস করলে সব উলটো পালটা জবাব দেয়। নব্বুই-এর গাঁট পেরোন চাট্টিখানি কথা নয়। লঞ্জিভিটির একটা লিমিট আছে। নেচার মানুষকে সেই ভাবেই তৈরি করেছে। বার্নার্ড শ', বার্ট্রান্ড রাসেল, পি জি উডহাউস—কেউ পৌঁছতে পারেননি একশো। যদুনাথ সরকার পারেননি। সেঞ্চুরি কি মুখের কথা? আর ইনি বলছেন একশো-ছাব্বিশ। হুঃ!'

'জোরো আগার নাম শুনেছিস?' খেঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন মামা।

'না। কে জোরো আগা?'

'তুর্কীর লোক। কিম্বা ইরানের। ঠিক মনে নেই। থার্টি ফোর-থার্টি ফাইভের কথা। একশো চৌষট্টি বছরে মারা যায়। সারা বিশ্বের কাগজে বেরিয়েছিল মৃত্যু-সংবাদ।'

'বোগাস।'

ছোটদা মুখে যাই বলুক, কালী ঘোষালের বাড়ি যখন গেলাম আমরা, সে বোধ হয় অবিশ্বাসটাকে আরো পাকা করার জন্যই আমাদের সঙ্গে গেল। গোপেন-বাবুই নিয়ে গেলেন। বাবা বললেন, 'আপনি আলাপটা করিয়ে দিলে অনেক সহজ হবে। চেনা নেই শোনা নেই, কেবল একশো ছাব্বিশ বয়স বলে দেখা করতে যাচ্ছি, এটা যেন কেমন কেমন লাগে।' ছোনিদা অবিশ্যি সঙ্গে নোটবুক আর দুটো ডট পেন নিয়েছে। মা বললেন, 'আজ তোমরা আলাপটা সেরে এস। আমি এর পর দিন যাব।'

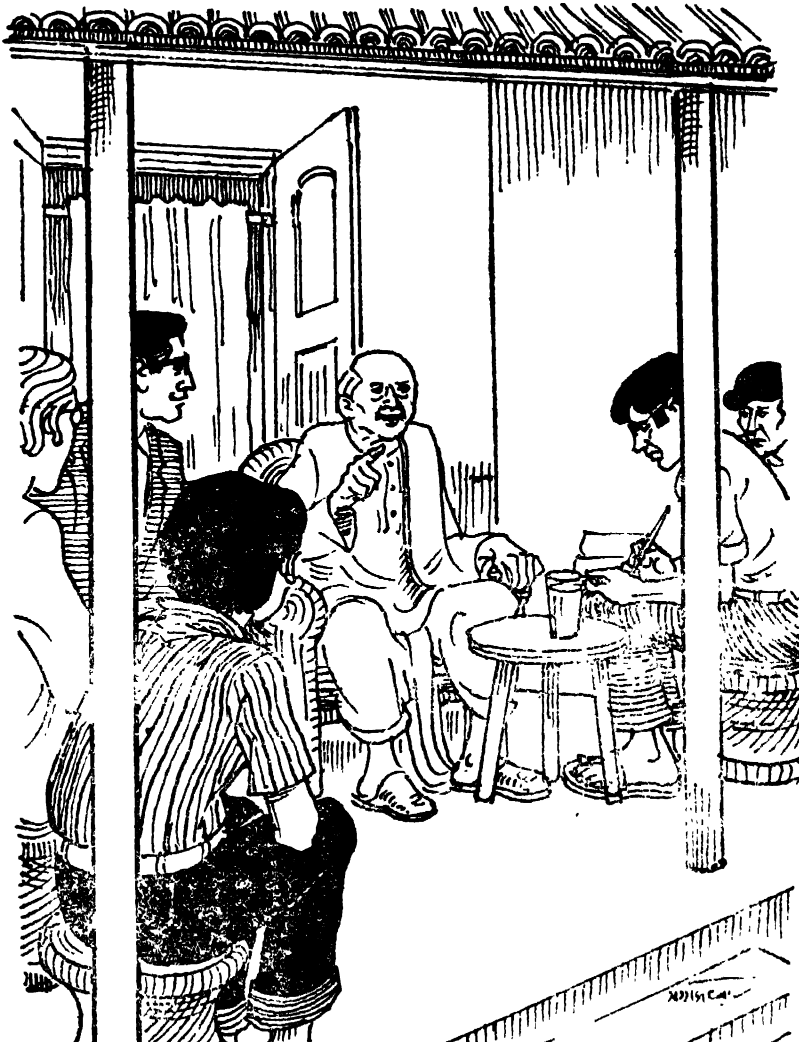
কালী ঘোষালের বাড়ির সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ার, কাঠের চেয়ার, মোড়া আর টুলের বহর দেখে বুঝলাম সেখানে রেগুলার লোকজন আসতে শুরু করেছে। ব্রেকফাস্টের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা, কারণ গোপেনবাবু বললেন ওটাই বেস্ট টাইম। গোপেনবাবুর 'ঘোষাল সাহেব বাড়ি আছেন?' হাঁকের মিনিট খানেকের মধ্যেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। মন খালি বলছে একশো ছাব্বিশ—একশো ছাব্বিশ—একশো ছাব্বিশ—অথচ চেহারা দেখলে সত্যিই আশির বেশি মনে হয় না। ফরসা রং, বাঁ গালে একটা বেশ বড় আঁচিল, টিকোলো নাক, চোখে পরিষ্কার চাহনী, কানের দুপাশে দুগোছা পাকা চুল ছাড়া বাকি মাথায় চকচকে টাক। এককালে দেখতে বোধহয় ভালোই ছিলেন, যদিও হাইট পাঁচ ফুট ছয়-সাতের বেশি নয়। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পাজামা, কট্‌কি চাদর, পায়ে সাদা কট্‌কি চটি। চামড়া যদি কুঁচকে থাকে ত চোখের দুপাশে আর থুতনির নিচে।

আলাপের ব্যাপারটা সারা হলে ভদ্রলোক আমাদের বসতে বললেন। ছোটদা থামের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার মতলব করেছিল বোধহয়, বাবা 'রঞ্জু, বোস্ না' বলতে একটা টুলে বসে পড়ল। সে এখনো গম্ভীর।

'এভাবে আপনার বাড়ি চড়াও করাতে ভারী লজ্জিত বোধ করছি আমরা', বললেন বাবা, 'তবে বুঝতেই পারছেন, আপনার মতো এমন দীর্ঘজীবী মানুষ ত দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তাই ..'

ভদ্রলোক হেসে হাত তুলে বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'অ্যাপোলোজাইজ করার কোনো প্রয়োজন নেই। একবার যখন বয়সটা বেরিয়ে পড়েছে, তখন লোকে আসবে সেটা ত স্বাভাবিক! বয়সটাই যে আমার বিশেষত্ব, ওটাই একমাত্র ডিস্টিংশন—সেটা কি আর বুঝি না? আর আপনারা এলেন কষ্ট করে, আপনাদের সাথে আলাপ হল, এ ত আনন্দের কথা।'

'তাহলে একটা কথা বলেই ফেলি', বললেন বাবা। 'একটা অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন। আমার এই ভাইপোটি নাম শ্রীকান্ত চৌধুরী, হল সাংবাদিক। এর খুব শখ আপনার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় সেটা ওর কাগজে ছাপায়। অবিশ্যি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'



'আপত্তি কিসের?' ভদ্রলোক অমায়িক হেসে বললেন। 'শেষ জীবনে যদি খানিকটা খ্যাতি আসে, সে ত আমারই ভাগ্য। গণ্ডগ্রামে কেটেছে সারাটা জীবন। তুলসীয়ার নাম শুনেছেন? শোনেননি। মুর্শিদাবাদে। রেলের কানেকশন নেই। বেলডাঙা জানেন ত? বেলডাঙায় নেমে সতের কিলোমিটার দক্ষিণে। তুলসীয়ায় জমিদারী ছিল আমাদের। সে সব ত আর নেই, তবে বাড়িটা আছে। তারই এক কোনায় পড়ে আছি। সেখানকার লোকে বলে যমের অরুচি। বলবেনাই বা কেন। গৃহিণী গত হয়েছেন বাহান্ন বছর আগে। ভাই বোন ছেলে মেয়ে কেউ নেই।

নাতি আছে একটি, ডাক্তারি করে, তারও আসার কথা ছিল; এক রুগীর এখন-তখন অবস্থা, তাই শেষ মুহূর্তে আসতে পারলে না। একাই আসতে পারতুম, চাকর সঙ্গে ছিল, নাত-বৌ দিলে না। সে এসেছে সঙ্গে। এই তিনদিনেই পুরো সংসার পেতে বসেছে। ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে সব।'

ডট পেনে আওয়াজ নেই। তবে আড়চোখে দেখছি ছেনিদা দাঁতে দাঁত চেপে ঝড়ের বেগে লিখে চলেছে। টেপরেকর্ডারটার ব্যাটারি খতম, সেটা টের পেয়েছে আসার দিন, রোববারে। তাই কলম ছাড়া গতি নেই। সঙ্গে একটা ধার করা পেনট্যাক্স ক্যামেরা আছে। কোনো একটা সময়ে সেটার সদ্ব্যবহার হবে নিশ্চয়ই। ছবি ছাড়া এ লেখা ছাপা হবে কি করে?

'কিছু মনে করবেন না', ফাঁক পেয়ে বললেন মামা, 'আমি আবার একটু পামিস্ট্রির চর্চা-টর্চা করি। বিলিতি মতে অবশ্য। তা, আপনার হাতখানা যদি একবার দেখতে দেন। শুধু একবারটি চোখ বুলোব।'

'দেখুন না।'

কালী ঘোষাল ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, মামা হাতটা ধরে তার উপর ঝুঁকে পড়ে মিনিট খানেক দেখে মাথা নেড়ে বললেন, 'ন্যাচারেলি। ন্যাচারেলি। আপনার বয়সের সঙ্গে তাল রেখে আয়ুরেখাকে বাড়তে গেলে সেটা হাত ছেড়ে কব্জিতে এসে নামবে। আসলে শতায়ু বা শতাধিক আয়ুর জন্য মানুষের হাতে কোনো প্রভিশন নেই। থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

এবার বাবা বললেন, 'আপনার স্মরণশক্তি কি এখনো, মানে—?'

'মোটামুটি ভালোই আছে', বললেন কালী ঘোষাল।

'কলকাতায় কি আপনি একেবারেই আসেননি?' প্রশ্ন করল ছেনিদা।

'এসেছি বৈকি। পড়াশুনা ত হেয়ার স্কুল আর সংস্কৃত কলেজে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে হস্টেলে থাকতুম।'

'ঘোড়ার ট্রাম—?'

'ঢের চড়েছি। দু' পয়সা ভাড়া ছিল লালদীঘি টু ভবানীপুর। রিকশা ছিল না তখন। পালকির একটা বড় স্ট্যাণ্ড ছিল শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে। পালকি বেহারাদের স্ট্রাইক হয় একটা, সে কথাও মনে আছে। আজকাল যেমন রাস্তাঘাটে কাক-চড়ুই, তখন হাড়গিলে চরে বেড়াত কলকাতার রাস্তায়। বলত স্ক্যাভেঞ্জার বার্ড। আবর্জনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খেত। প্রায় আমার কাঁধের হাইট, তবে একদম নিরীহ।'

'তখনকার কোনো বিখ্যাত পার্সোনালিটিকে মনে পড়ে?' ছেনিদাই চালিয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন।

'বিখ্যাত মানে, রবীন্দ্রনাথকে পরে দেখিছি অনেক। আলাপ অবশ্যই ছিল না; আমি আর এমন একটা কে যে আলাপ থাকবে। তবে একবার তরুণ বয়সের রবীন্দ্রনাথকে দূর থেকে দেখেছিলাম। কবিতা আবৃত্তি করলেন। হিন্দু মেলায়।'

'সে ত বিখ্যাত ঘটনা!' বললেন বাবা।

'বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিনি কখনো। একটানা কলকাতায় থাকলে হয়ত দেখা পেতুম। কিন্তু আমি কলেজের পাঠ শেষ করেই দেশে ফিরে যাই। তবে হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর। সে এক ব্যাপার বটে। হেদোর পাশ দিয়ে হাঁটছি আমরা তিন বন্ধুতে, বিদ্যাসাগর আসছেন উলটো দিক থেকে। মাথায় ছাতা, পায়ে চটি,

কাঁধে চাদর। আমার চেয়েও মাথায় খাটো। ফুটপাথে কে জানি কলা খেয়ে ছোবড়া ফেলেছে, বিদ্যাসাগরের পা পড়তেই পপাত চ। আমরা তিনজন দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে ধরাধরি করে তুললুম। হাতের ছাতা ছিটকে পড়েছে রাস্তায়, সেটাও তুলে এনে দিলুম। ভদ্রলোক উঠে কী করলেন জানেন? এ জিনিস ওনার পক্ষেই সম্ভব। যে ছোবড়ায় আছাড় খেলেন সেটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে কাছে ডাস্টবিন ছিল, তার মধ্যে ফেলে দিলেন।'

আমরা আরো আধ ঘণ্টা ছিলাম। তার মধ্যে চা এল আর তার সঙ্গে নির্ঘাত নাত-বৌয়ের তৈরি ক্ষীরের ছাঁচ। শেষ কালে যখন বিদায় নিতে উঠলাম, ততক্ষণে ছেনিদা একটা টাটকা নতুন নোটবুকের প্রায় অর্ধেক ভরিয়ে ফেলেছে। সেই সঙ্গে অবিশ্যি ছবিও তুলেছে খান দশেক। সেই ফিল্ম পার্শেল করে চলে গেল কলকাতায় ছেনিদার খবরের কাগজের আপিসে। সেই খানেই ছবি ডেভেলপিং প্রিন্টিং হয়ে ভালো ছবি বাছাই করে কাগজে বেরোবে।

পাঁচ দিনের মধ্যে ছেনিদার লেখা ছবি সমেত কাগজে বেরিয়ে সে কাগজ আমাদের হাতে চলে এল। লেখার মাথায় বড় বড় হরফে হেডলাইন--'বিদ্যাসাগরের হাত ধরে তুলেছিলাম আমি'।

ছেনিদা 'স্কুপ' করল ঠিকই, আর তার ফলে আপিসে তার যে কদর বেড়ে যাবে তাতেও সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর পরে আমরা থাকতে থাকতেই কলকাতার আরো সাতখানা দিশি-বিলিতি কাগজের সাংবাদিক এসে কালী ঘোষালের ইন্টারভিউ নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা বলা হয়নি। ফিল্ম স্টার অংশুমান চ্যাটার্জি তার চেলাচামুণ্ডাদের নিয়ে মার্সেডিজ গাড়ি করে দশ দিনের ছুটি পাঁচ দিনে খতম করে কলকাতায় ফিরে গেছে। তার নাকি হঠাৎ শুটিং পড়ে যাওয়াতে এই ব্যবস্থা। শর্মি খুব একটা আপশোষ করল না, কারণ এই ফাঁকে তার অটোগ্রাফ নেওয়ার কাজটা সে সেরে নিয়েছে। সত্যি বলতে কি, খাতা নিয়ে যখন অংশুমানের সঙ্গে দেখা করে, তখন 'তোমার নাম কী খুকী?' জিগ্যেস করাতে হিরোর উপর থেকে অন্তত সিকি ভাগ ভক্তি তার এমনিতেই চলে গিয়েছিল। তারপর বিশ্বের অন্যতম প্রাচীনতম মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে তার মন ভরে গেছে। বাবা বললেন, 'সে থাকতে একটা বুড়ো-হাবড়াকে নিয়ে এত মাতামাতি হচ্ছে এটা বোধ হয় স্টার বরদাস্ত করতে পারলেন না।'

আমরা ফিরে আসার আগের দিন রাত্রে কালী ঘোষাল আর তার নাত বৌ আমাদের বাড়িতে খেলেন। অল্পই খান ভদ্রলোক, তবে যেটুকু খান তৃপ্তি করে খান। 'জীবনে কখনো ধূমপান করিনি, তাছাড়া পরিমিত আহার, দুবেলা হাঁটা, এই সব কারণেই বোধহয় যমরাজ আমার দিকে এগোতে সাহস পাননি!'

'আপনার ফ্যামিলিতে আর কেউ খুব বেশিদিন বেঁচেছিলেন কি?' জিগ্যেস করলেন বাবা।

'তা বেঁচেছিলেন বৈকি। শতাধিক আয়ুর সৌভাগ্য আমার পিতামহ প্রপিতামহ দুজনেরই হয়েছিল। প্রপিতামহ তন্ত্রসাধনা করতেন। একশো তেরো বছর বয়সে হঠাৎ একদিন ঠাকুরদাকে ডেকে বললেন, "গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর। আমার সময় এসেছে।" অথচ বাইরে থেকে ব্যাধির কোনো লক্ষণ নেই। চামড়া টান, দাঁত পড়েনি একটাও, চুলে যৎসামান্য পাক ধরেছে। যাই হোক, অন্তর্জলির

ব্যবস্থা হল। হরনাথ ঘোষাল শিবের নাম করতে করতে কোমর অবধি গঙ্গাজলে শোয়া অবস্থায় চক্ষু মুদলেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে। আমার বয়স তখন বেয়াল্লিশ। সে দৃশ্য ভুলব না কখনো।'

'রিমার্কেবল!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মামা।

কলকাতায় ফেরার সাতদিন পরে ছোটদা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল হাতে একটা বাঁধানো মোটা বই নিয়ে। বই নয়, পত্রিকা। নাম 'বায়স্কোপ'। বলল নবরঙ্গ পত্রিকার এডিটর সতীশ বাগচীর কাছে পঞ্চাশ টাকা জমা রেখে বইটা একদিনের জন্য বাড়িতে আনতে পেরেছে। দুটো পাতার মাঝখানে একটা বাসের টিকিট গোঁজা ছিল। সেই পাতায় খুলে বইটা আমার সামনে ফেলে দিল।

ডান দিকের পাতায় একটা বেশ বড় ছবি, যাকে বলে ফিল্মের 'স্টিল', চকচকে আর্ট পেপারে ছাপা। পৌরাণিক ছবির স্টিল। ফিল্মের নাম 'শবরী'। ছবির তলায় লেখা--'প্রতিমা মুভীটোনের নির্মীয়মাণ ছায়াচিত্র শবরী-তে শ্রীরামচন্দ্র ও শবরীর ভূমিকায় যথাক্রমে নবাগত কালীকিঙ্কর ঘোষাল ও কিরণশশী'।

'চেহারাটা মিলিয়ে দ্যাখ, স্টুপিড', বলল ছোড়দা।

দেখলাম মিলিয়ে। কিরণশশীর চেয়ে ইঞ্চি তিনেক লম্বা—অর্থাৎ মাঝারি হাইট, খালি গা বলে বোঝা যায় গায়ের রং ফরসা, টিকোলো নাক, আর ডান গালে বেশ একটা বড় আঁচিল। বয়স দেখে পঁচিশের বেশি বলে মনে হয় না।

আমার কেমন যেন বুকটা খালি-খালি লাগছে। জিগ্যেস করলাম, 'এটা কবেকার ছবি, ছোড়দা?'

'সেপাই মিউটিনির আটষট্টি বছর পরে। নাইনটীন টোয়েন্টি-ফোর। সাইলেন্ট ছবি। তার হিরো হচ্ছেন কালীকিঙ্কর ঘোষাল। এই প্রথম, আর এই শেষ ছবি। তিন মাস পরের সংখ্যায় ছবির সমালোচনা আছে। বলছে নবাগত নায়ক আগমন না করিলে কোনো ক্ষতি ছিল না। চিত্রাভিনেতা হিসাবে এঁর কোনো ভবিষ্যৎ নাই।'

'মানে, তাহলে ওঁর বয়স'—

'যা মনে হয় তাই। আশি-বিরাশি। চব্বিশ সালের এ ছবিতে যদি বছর পঁচিশ বয়স হয়, তাহলে হিসেব করে দ্যাখ ওর সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি আসলে ওর বৌ। গোপেনবাবু প্রথমে যা ভেবেছিলেন তাই।'

'লোকটা তাহলে একেবারে—'

'বোগাস। ফোর-টোয়েন্টি। ভাবছিলাম কাগজে লিখে সব ফাঁস করে দিই, কিন্তু করব না। কারণ লোকটার ব্রেনটা শার্প আছে। সেটার তারিফ করতেই হয়। যখন বয়স ছিল তখন রাম-হড়কান হড়কেছে, কিন্তু শেষ বয়সে দেখিয়ে ত দিল- একটি মিথ্যে কথা বলে কী করে স্পটলাইটটা টপ স্টারের উপর থেকে টেনে এনে নিজের উপর ফেলতে হয়!'

ধাপ্পা

'চার্লস ওয়েকম্যানের 'হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক' আপনার ক' ভল্যুম ছিল?'

সমরেশ ব্রহ্ম ইণ্টারন্যাশনাল ম্যাজিক সার্কলের চিঠির উত্তরে সইটা করে মুখ তুলে চাইল মহিমের দিকে। তাঁর বন্ধু অধ্যাপক রণেন সেনগুপ্তর ছেলে মহিম। সবে লাইব্রেরিয়ানশিপ পাশ করেছে। সে নিজেই আগ্রহ করে তার সমরেশকাকার আড়াই হাজার অগোছালো বইগুলোকে বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে গুছিয়ে শেল্‌ফে রেখে তাদের একটা তালিকা করে দেবার ভার নিয়েছে।

'কেন, দু ভল্যুম!' বলল সমরেশ।

'মাত্র একটাই পাচ্ছি। সেকেণ্ডটা?'

'সে কি! ভালো করে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! সেটটা কানা হয়ে গেল? ও বই যে আর পয়সা দিলেও পাওয়া যায় না।'

সমরেশ ব্রহ্মের বইয়ের নেশা সেই কলেজ থেকেই। পঁচিশ বছর আগের কথা। ইতিহাসের ছাত্র ছিল সে, তবে তার বাইরেও অনেক বিষয়ের বইয়ের প্রতি তার আকর্ষণ। যেমন ভ্রমণ কাহিনী, শিকার কাহিনী, প্রত্নতত্ত্ব, অ্যানাটমি। আর ম্যাজিক। ম্যাজিক ছিল প্রথমে সমরেশের হবি। তারপর ক্রমে সেটা নেশায় দাঁড়ায়। বাপ ছিলেন কলকাতার নামকরা ব্যারিস্টর আদিনাথ ব্রহ্ম। ছেলেও বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসে, এমন একটা ইচ্ছে বাপের ছিল, এবং সে ইচ্ছে অনুযায়ী সমরেশ গিয়েওছিল বিলেত। কিন্তু কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে তিন মাস পড়ার পর জাদুকর মার্কো সিলভারস্টোনের সঙ্গে আলাপ হয়ে পড়াশুনা শিকেয় উঠল। সমরেশ তার বাপকে জানাল সে ব্যারিস্টারি পড়বে না; তার শখ চেপেছে ম্যাজিসিয়ান হবার। অনুরোধটা যাতে আরো জোরদার হয় সেই উদ্দেশ্যে নিজের চিঠির সঙ্গে সিলভারস্টোনেরও একটা চিঠি সে পুরে দিল খামের মধ্যে। সিলভারস্টোন লিখেছে আদিনাথ ব্রহ্মকে—'তোমার ছেলের বন্ধু হিসেবেই তোমাকে লিখছি—সমরেশ ইজ ওয়াণ্ডারফুলি ক্লেভার উইথ হিজ হ্যাণ্ডস। ঐন্দ্রজালিক হিসেবে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে বলে আমি মনে করি।'

এক্ষেত্রে যে-কোনো সাধারণ বাপই হয় মর্মাহত হতেন, না হয় মারমুখো হতেন। কিন্তু আদিনাথ ছিলেন সাধারণের বাইরে। তিনি ছেলেকে লিখলেন, 'তোর স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তোর মধ্যে যদি কোনো বিশেষ ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে সেটার স্ফুরণ হোক সেটাই আমার কাম্য। লণ্ডনে যদি ম্যাজিক শেখার সুযোগ থাকে তাহলে তার জন্য কী খরচ পড়বে সেটা আমাকে জানাতে দ্বিধা করিস না। আমি টাকা পাঠিয়ে দেব।'

সমরেশ কিন্তু আর লন্ডনে থাকেনি। সে দুমাসের মধ্যে দেশে ফিরে আসে এবং বাড়িতেই ম্যাজিক অভ্যাস শুরু করে। তখন তার বয়স বাইশ। পঁচিশ বছর বয়সে সে প্রথম মঞ্চে ম্যাজিক দেখায়। সেটা অবিশ্যি একক প্রদর্শনী; শুধু হাত সাফাইয়ের খেলা। তা সত্ত্বেও এই তরুণ জাদুকরের আশ্চর্য দক্ষতার প্রচুর তারিফ করে দৈনিক কাগজের সমালোচকেরা।

বত্রিশ বছর বয়সে সাতজন সহকর্মী ও স্টেজ ইল্যুশনের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন ব্রাম্, দ্য গ্রেট। শো-এর শেষে দর্শকের তুমুল করধ্বনিতে হলের প্রথম সারিতে বসা আদিনাথ ব্রহ্মের বুক গর্বে দশ হাত হয়।

উনিশশো চুয়াত্তরে আদিনাথের মৃত্যু হয়। বাপের একমাত্র সন্তান হিসেবে সমরেশ তাঁর সম্পত্তির মালিকানা পায়। কিন্তু ততদিনে তার নিজের রোজগারও কিছু কম নয়। ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে ডাক ত আসেই, সেই সঙ্গে বিদেশ থেকেও আহ্বান আসা শুরু হয়েছে। আইটেমগুলোর উৎকর্ষ ছাড়াও, সমরেশের শো-এর দুটো বিশেষত্ব দেশ-বিদেশের দর্শককে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। জাদু-করের বুক্‌নিটা তার ম্যাজিকের একটা অঙ্গ বলেই এতদিন লোকে মেনে নিয়েছে। সমরেশই প্রথম দেখাল যে কথা না বলেও জাদু হয়। আড়াই ঘণ্টা শো-এর মধ্যে একটিবারের জন্যও মুখ খোলে না সে। তার বদলে কানে শোনার জন্য যেটা থাকে সেটা হল সমরেশের দ্বিতীয় বিশেষত্ব। সেতার সরোদ বাঁশী ও তবলার একটি চমৎকার অর্কেস্ট্রার থাঁটি রাগসংগীত সমরেশ ব্যবহার করে তার জাদুর সঙ্গে। সব দেশেরই দর্শকের কাছে এটা একেবারে নতুন জিনিস। বিশেষ বিশেষ জাদুর সঙ্গে বিশেষ বিশেষ রাগ যেভাবে থাপ খেয়ে যায় সেটা দর্শকের চিত্ত জয় না করে পারে না।

আজ একচল্লিশ বছর বয়সে সমরেশের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তার ম্যাজিকের উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে তার জনপ্রিয়তাও বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। কলকাতায় তার ম্যাজিকের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সাত দিনের সব টিকিট বিক্রী হয়ে যায়। শো-এর শেষে আনন্দে ও বিস্ময়ে বিভোর অবস্থায় ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষের দল বেরিয়ে আসে হল থেকে। সমরেশও জানে যে একসঙ্গে হাজার দু' হাজার লোককে সুকৌশলে ধাপ্পা দেওয়ার আর্ট আজ তার হাতের মুঠোয়। আমে-রিকানরা তার তুলনা করে থার্সটন ও হুডিনির সঙ্গে, বৃটিশরা করে ম্যাসকেলাইন ও ডেভিড ডেভাণ্টের সঙ্গে, ফরাসীরা রোবেয়র-উদ্যাঁ আর হংকং-এর চীনেরা চিং-লিং ফু-এর সঙ্গে।

তবে সমরেশের আকাঙ্ক্ষার শেষ এখানেই নয়; তার দৃষ্টি এখনো সামনের দিকে। আরো নতুন-নতুন জাদুর উদ্ভব করবে সে, দর্শকদের আরো চমক দেবে, মুগ্ধ করবে, বিস্মিত করবে।

আর তাই তার বই কেনা আর বই পড়াও শেষ হয়নি। ম্যাজিকের বই ত বটেই, সেই সঙ্গে আছে উইচ্‌ক্রাট, ভূডুইজ্‌ম ইত্যাদি আদিম ম্যাজিক, আর হিপ্‌নটিজ্‌ম, ক্লেয়ারভয়েন্স, ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম ইত্যাদি সংক্রান্ত বই। শুধু এই সব বইয়েতেই তার তিনখানা বড় বুককেস ভরে গেছে। বাইরে থেকে অর্ডার আছে আরো খান-পনেরো সদ্য প্রকাশিত বইয়ের। অনেকটা সময় বাইরে থাকতে হয় বলে বইগুলো অগোছালো ভাবে ছড়িয়ে ছিল, তাই বন্ধুপুত্রের প্রস্তাবে সমরেশ আপত্তি করেনি। মহিমের কাজ শেষ হতে লাগবে আরো দিন চারেক।

এককালে বন্ধুবান্ধবদের বই ধার দিয়েছে সমরেশ, যদিও খুশিমনে দেয়নি

কখনো। কেউ কিছু চাইলে না বলাটা ছিল সমরেশের ধাতের বাইরে। এটা যে চরিত্রের একটা দুর্বলতা সেটা সে নিজেও বুঝত, কিন্তু বুঝেও কারুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি কখনো। ধার দেওয়া বইয়ের হিসেব রাখার জন্য একটি খাতা করেছিল সমরেশ; যে বই নিচ্ছে সে নিজেই তার নাম, বইয়ের নাম এবং ধার নেবার তারিখ সে খাতায় লিখে রাখত। বই ফেরত এলে সমরেশ এই নাম-তারিখের উপর দিয়ে কলম চালিয়ে পাশে একটা সই করে রাখত।

কাজে সফলতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চরিত্র আরো দৃঢ় হয়, আত্মপ্রত্যয় বাড়ে। সেই কারণেই বোধ হয় বছর দশেক হল সমরেশ বই ধার দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে—'মাপ করো ভাই, ওই একটি অনুরোধ রাখতে পারব না'—এই কথাটা বলা হঠাৎ তার পক্ষে সহজ হয়ে গিয়েছিল। আজকাল ব্যাপারটা সকলেই জানে, তাই আর অনুরোধটা কেউ করেও না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই একটা বই বেপাত্তা হয় কি করে?

ওই খাতাটা একবার দেখলে হত না কি? কিন্তু ম্যাজিকের বই নেবার মতো লোক—?

ঠিক ত! তেমন লোকও ছিল। সমরেশের মনে পড়েছে। মহিম পাশেই দাঁড়িয়ে; সমরেশ তার দিকে ফিরল।

'শোন মহিম, আমার ইতিহাসের বইয়ের শেল্ফের ডানদিকে একটা ছোট রাইটিং টেব্ল আছে, দেখেছ ত? তার দেরাজে দেখবে একটা নীল রঙের নোটবুক আছে। এককালে বই ধার দিয়েছি লোককে; যে নিত সে ওই নোটবুকে লিখে রাখত। একবার ওটাতে দেখ ত হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক কেউ ধার নিয়েছিল কিনা?'

মহিম এক মিনিটের মধ্যেই খাতাটা নিয়ে এল, তার মুখে হাসি।

'পাওয়া গেছে', বলল মহিম, 'লাস্ট এন্ট্রি। নামটা কাটা হয়নি।'

'সুশীল তালুকদার কি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক ধরেছি। দেখি খাতাটা।'

যাক, অন্তত হদিস পাওয়া গেছে। চার্লস ওয়েকম্যানের হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক ভল্যুম ওয়ান ধার নিয়েছিল সুশীল তালুকদার ১০-১০-৭২ তারিখে। অর্থাৎ আজ থেকে দশ বছর আগে। ফেরত দেয়নি। হস্তাক্ষর সুশীলের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু সুশীল ত এসেছিল দিন পাঁচেক আগে। বিকেলের দিকে। তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জানিয়ে স্লিপ পাঠিয়েছিল মহিমের হাতেই। অসুস্থতার অজুহাতে সমরেশ দেখা করেনি। সাক্ষাতের কারণ ত জানাই আছে। হয় শো-এর টিকিটের জন্য হাতে-পায়ে ধরা, না হয় কোনো ফাংশনে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি। এককালে প্যাণ্ডেলে ম্যাজিক দেখিয়েছে বৈকি সমরেশ। কিন্তু এখন যে সমরেশ আর সে-সমরেশ নেই সে কথাটা অনেকেই ভুলে যায়। আর টিকিটের জন্য আবদার জিনিসটা ত বাঙালীদের মজ্জাগত। ফুটবলের টিকিট, ক্রিকেটের টিকিট, থিয়েটারের টিকিট, গানবাজনার টিকিট, ম্যাজিকের টিকিট—এর আর শেষ নেই। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনতে হবে ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে। যদি আসল লোকের কাছে চাইলে পাওয়া যায় তাহলে মিথ্যে হ্যাঙ্গাম কেন? যতসব কুঁড়ের দল। অথচ না-দিলে বলবে রামা দ্য গ্রেটের ভারী দেমাক হয়েছে; নইলে পুরোন আলাপীদের এই ভাবে নিরাশ করে?



'এ ভদ্রলোক ত এসেছিলেন সে দিন', বলল মহিম।

'হ্যাঁ। নির্ঘাত কোনো ফেভার চাইতে। সঙ্গে করে বইটা নিয়ে এলেই হত, কিন্তু তা করবে না। তখনকার দিনে আড়াইশো টাকা দাম ছিল সেটটার। বহু-দিন আউট অফ প্রিন্ট। আজকের দিনে নতুন করে ছাপলে দাম হবে হাজার টাকা।'

সমরেশ কথা থামিয়ে ভুরু কুঞ্চিত করল। তারপর বলল, 'কিরকম দেখলে ভদ্রলোককে? আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। বহুকাল দেখা নেই।'

'রোগা, আধপাকা চুল, ঘন ভুরু, চোখদুটো তীক্ষ্ন। আমি বললাম আপনি এ সময় দেখা করেন না, তাও জোর করে আমাকে দিয়ে স্লিপ পাঠালেন। বললেন ওনার নাম শুনলে নাকি আপনি দেখা করতে পারেন।'

'হুঁ...'

সুশীল তালুকদারকে ম্যাজিকের বইটা ধার দেবার স্মৃতি সমরেশের মন থেকে একেবারে মুছে গেছে। কী মুর্খই ছিল সে নিজে দশ বছর আগে। নইলে এমন বই কেউ ধার দেয়? তখনও পর্যন্ত সুশীলের ম্যাজিক সম্বন্ধে বেশ আগ্রহ ছিল সেটা সমরেশের মনে আছে। হাত সাফাইটা বেশ ভালোই পারত। তবে ধৈর্য বা অধ্যবসায় কোনোটাই ছিল না।

তাছাড়া অবিশ্যি সমরেশের মতো ধনী বাপও ছিল না। তাই ম্যাজিকটাকে

পেশা হিসেবে নেবার প্রশ্ন সুশীলের ক্ষেত্রে ওঠেনি। সেই লোকের কাছে আজ দশ বছর থেকে পড়ে আছে সমরেশের সংগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান দুটি বইয়ের একটি।

ভরসা এই যে, জানা যখন গেছে তখন ফেরত পাবার একটা উপায় হবে নিশ্চয়ই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কলামন্দিরে শো ছিল। রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে এসে সমরেশের আবার মনে পড়ল বইয়ের কথাটা। বছর বারো আগে প্রথম কিনে বইদুটো সুশীলকে দেখিয়েছিল সেটাও মনে পড়ল। সুশীলের মন্তব্যটাও মনে পড়ল—'জাদুবিদ্যার ইতিহাসে একদিন তোমারও নাম লেখা হবে সমরেশ!' সুশীলের অবস্থা তেমন সচ্ছল নয় সেটা সমরেশ জানে। সে বিয়ে করেছিল বেশ অল্প বয়সে। দুটি মেয়েও হয়েছিল। একটির অন্নপ্রাশনে সমরেশ নেমন্তন্ন খেয়েছিল। ইতিমধ্যে আরো সন্তান হয়ে থাকতে পারে। এমন মানুষের টাকার টানাটানি আশ্চর্য ঘটনা নয়। সে যদি বইটা বিক্রী করে দিয়ে থাকে? মহামূল্য সেটটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে মনে করে সমরেশের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

পন্থা একটাই। সে নিজে বইটা ফেরত নিয়ে আসেনি, তখন তাকে চিঠি লিখে সেটার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে।

সমরেশ লিখল, 'প্রিয় সুশীল, সেদিন তুমি এলে, অথচ অসুস্থতার জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। আশা করি কিছু মনে করনি। আমার একটা বই—ওয়েকম্যানের হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক প্রথম খণ্ড—১০-১০-৭২ তারিখে আমার কাছ থেকে তুমি পড়তে নিয়েছিলে—একথা আমার নোটবুকে তোমার নিজের হস্তাক্ষর বলছে। ওটা আমার সংগ্রহের একটা সেরা বই, এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য। পত্রপাঠ যদি সেটা ফেরত দিতে পার ত আশ্বস্ত হই। সকালের দিকে এলে চা-যোগে কিঞ্চিৎ আড্ডাও হতে পারে। শুভেচ্ছা নিও। সমরেশ।'

চিঠিটা লিখে বার দুয়েক পড়ে দেখল সমরেশ। ফেরত দেবার ব্যাপারটা বেশ জোর দিয়েই বলা হয়েছে, তবে রূঢ় ভাবে নয়। এটাই দরকার।

খামের উপর ঠিকানা লিখে টিকিট লাগিয়ে সমরেশ ড্রাইভার রঘুনাথের হাতে চিঠিটা দিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ ডাকে ফেলে আসার জন্য।

কলকাতার ডাকবিভাগ যে সবসময়ে খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে তা নয়। তবে তাদের গাফিলতির জন্য চার দিন সময় দিয়েও যখন সুশীল তালুকদার দেখা দিল না, তখন সমরেশ রীতিমতো বিরক্ত বোধ করল। এখন করা কী? নিজে গিয়ে সরাসরি বইটা ডিমান্ড করাটা কি একটু বিসদৃশ মনে হবে? তা হলেও যদি ধরে নেওয়া যায় যে চিঠি সুশীলের হাতে পৌঁছায়নি, ডাকে খোয়া গেছে, তাহলে এ ছাড়া গতি কী? বুক শেলফ-এর দিকে চোখ পড়লেই দ্বিতীয় খণ্ডের পাশে প্রথম খণ্ডের অভাবে সমরেশের মনটা হু হু করে ওঠে। বইয়ের নেশা এমনই জিনিস। ওটা উদ্ধার না করা অবধি শান্তি নেই।

সাতের তিন মাধব লেনে থাকে সুশীল তালুকদার। রবিবার সকালে গেলে তাকে বাড়িতে পাবার সম্ভাবনাটা বেশি, তাই সেটাই করল সমরেশ। ন'টার সময় সুশীলের কলিং বেলে তার হাত পড়ল। মাধব লেনে এসময় লোক চলাচল যথেষ্ট। সমরেশ কোনো জনপ্রিয় ফিল্ম স্টার হলে আর রক্ষা ছিল না, কিন্তু

এমনি দেখে তাকে ব্রামা দ্য গ্রেট বলে চেনার কোনো উপায় নেই। স্টেজে সে গোঁফ ও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ব্যবহার করে এবং নিজের আসল চেহারা কাগজে ছাপতে দেওয়ায় তার নিষেধ আছে।

'কাকে চাই?'

দরজা খুলেছে একটি চাকর।

'সুশীলবাবু আছেন কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কী নাম বলব?'

'বলো যে সমরেশবাবু দেখা করতে এসেছেন।'

চাকর তাঁকে বসতে বলে ভিতরে চলে গেল বাবুকে ডাকতে।

দরজার পিছনে বৈঠকখানায় ছড়ানো রয়েছে গোটা চারেক সাধারণ সোফা ও চেয়ার, মাঝখানে একটা গোল কাশ্মীরী কাঠের টেবিল, এক পাশে একটা ছোট বইয়ের আলমারির মাথায় একটা ওয়াড় পরানো রেডিও, দেয়ালে গোটা তিনেক ছবি ও দু'রকম ক্যালেন্ডার।

সমরেশকে বসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার উঠতে হল। চোখ কপালে তুলে পর্দা ফাঁক করে হাসিমুখে ঘরে ঢুকেছে তার কলেজের সহপাঠী সুশীল তালুকদার।

'কী সর্বনাশ! এ কী সৌভাগ্য আমার! কোনদিকে সূর্য উঠল ভাই?'

'আমার চিঠিটা পাওনি বোধ হয়?

'পেয়েছি বৈকি!'

'তাহলে—?'

সমরেশ হতভম্ব। সুশীল বসেছে তার মুখোমুখি সোফায়।

'ব্যাপার কী জান? বইয়ের প্রতি তোমার যে কী দুর্বার আকর্ষণ সে ত জানি! আর সেদিন ত গিয়ে দেখলুম আরো কত বেড়েছে তোমার সংগ্রহ। তাই ভাবলুম, যদি জবাব না দিই তাহলে তোমার সশরীরে এসে পড়াটা খুব আশ্চর্য নয়। তা অনুমান ঠিকই করেছি, কী বল?'

সশরীরে এসে পড়ে সমরেশের যে খুব ভালো লাগছিল তা নয়। দুজনের জগৎটা যে একেবারে আলাদা হয়ে গেছে সেটা সে বেশ বুঝতে পারছিল। পৃথিবীর চল্লিশটা বড় শহরের কত লক্ষ লোককে সে তার জাদুবলে বশ করেছে, আরো কত লক্ষকে করবে। আর সুশীল? কত সংকীর্ণ তার জগৎটা! ভাবলে অনুকম্পাই হয়। বইটা পেলেই সমরেশ উঠবে। এর সঙ্গে বসে গালগল্প করার সময় তার নেই।

'তুমি চালটা ঠিকই চেলেছ', বলল সমরেশ। 'এমনিতে হয়ত সত্যিই আসা হত না। শো চলছে ত শহরে, তাই বেজায় ব্যস্ত। এবার বইটা যদি ফেরত দাও ত উঠে পড়ি।'

'বই?'

'আছে ত? নাকি—'

সুশীল তালুকদার হো হো করে হেসে উঠল।

'তোমার কোনো বই আমার কাছে নেই ভাই।'

'সে কি!'—যা আশঙ্কা করেছিল তাই। সে বই পাচার হয়ে গেছে।

'বই আছে তোমার বাড়িতেই', বলল সুশীল তালুকদার।

'মানে? খাতায় যে তোমার হাতে লেখা দেখলাম—'

'তা থাকবে না কেন? খাতাটা কোথায় থাকত সেটা ত আমার জানা। ওই

ছোকরাটির কথা শুনেই যখন বুঝলুম তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তখন মাথায় একটা মতলব এল। দেখিই না একটু রগড় করে! ওকে স্লিপ দিয়ে হটিয়ে দিলুম। তারপর দেরাজ খুলে দেখলুম নোটবুক সেখানেই আছে। ম্যাজিকের বইটা শেলফে দেখতে পাচ্ছিলুম, লিখে দিলুম খাতায় সেটার নাম, আমার নাম আর দশ বছর আগের একটা তারিখ। তারপর দু'ভল্যুম বইয়ের এক ভল্যুম বার করে নিয়ে লুকিয়ে রেখে দিলুম তোমারই ঘরে।'

'কোথায় ?'

'তোমার যে বাক্স প্যাটার্নের পুরোন গ্রামোফোনটা আছে, সেটার ঢাকনা খুললেই পাবে।'

'কিন্তু—কিন্তু...' কিঞ্চিৎ আশ্বস্তভাবের সঙ্গে একটা হতভম্বভাব সমরেশের মনটাকে দু'ভাগে চিরে ফেলেছে। এরকম পাগলামির কারণটা কী?

'কারণটা আর কিছুই না, ভাই', বলল সুশীল তালুকদার, 'সেদিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার দুই মেয়ের অটোগ্রাফের খাতা। ব্রামা দ্য গ্রেট আমার কলেজের সহপাঠী ছিল সেটা তাদের বলেছি। তার উপরে তোমার ম্যাজিক দেখে তারা অভিভূত। আবদার করল তোমার সই নিয়ে আসতে হবে। তুমি ত দেখা করলে না। তারা শুনে প্রচন্ড খাপ্পা, তোমার উপর থেকে ভক্তি চলে যায় আর কি! এটা হবে আমি জানি, যদিও হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বললুম বেচারা অসুখের জন্য আসতে পারেনি, এবার দেখিস্ একেবারে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হবে। আর হলও ত তাই!—ওরে রুনু ঝুনু! তোরা আয়রে!—দেখে যা তোদের বাপের কথা ঠিক হল কিনা!'

পরক্ষণেই পর্দা ফাঁক করে বারো থেকে ষোল বছর বয়সের দুটি ছিপ্‌ছিপে মেয়ে মুখে সলজ্জ হাসি ও চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে ঘরে ঢুকে সমরেশকে প্রণাম করে তার সামনে খাতা কলম ধরল।

সই দিতে দিতে সমরেশ ব্রহ্ম ভাবল তাকে ধাপ্পা দিতে পারে এমন লোকও এই কলকাতা শহরেই আছে এটা তার জানা ছিল না।

ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট

॥ ১ ॥

ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে আশ্চর্য গাছটা আবিষ্কার করলেন নিশিকান্তবাবু। সাহেব যে গাছপালা ভালবাসতেন সেটা করিমগঞ্জে এসেই শুনেছিলেন নিশিকান্তবাবু। ভারত স্বাধীন হবার বছর সাতেকের মধ্যেই সাহেব অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর দেশে ফিরে যান। তারপর থেকে এই বাংলোবাড়িটা খালিই পড়ে আছে। লোকে বলে সাহেবের গিন্নী নাকি এই বাড়িতে বজ্রাঘাতে মারা যান। সাদা গাউন পরা তাঁর ভূতকে নাকি বাগানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় পূর্ণিমার রাতে। তাই এ বাড়ির দিকে আর বিশেষ কেউ ঘেঁষে না।

নিশিকান্তবাবু বহরমপুরের সরকারী ইস্কুলে মাস্টারী থেকে রিটায়ার করে করিমগঞ্জে আসেন মাধব কবিরাজকে দিয়ে তাঁর বাতের চিকিৎসা করানোর জন্য। মাধব ডাক্তারের খ্যাতি দেশজোড়া না হলেও, প্রদেশজোড়া ত বটেই। বন্ধু তারক বাগচীর বাড়িতে এ-কদিন থেকে চিকিৎসা করিয়ে ফিরে যাবেন এই ছিল কথা। কিন্তু সে আর হল না। প্রথমত; এসে শুনলেন মাধব কবিরাজ মারা গেছেন দেড় মাস হল। তারপর তারক বাগচী বললেন, 'তুমি একা মানুষ বিয়ে থা করনি, কার জন্য ফিরবে বহরমপুরে? এখানেই থেকে যাও, কবিরাজ অর নো কবিরাজ। করিমগঞ্জের জলহাওয়াতেই তোমার বাত ভালো হয়ে যাবে।'

অনুরোধ এড়াতে পারেননি নিশিকান্তবাবু। একবার যেতে হয়েছিল বহরমপুর তল্পিতল্পা গুটিয়ে আনার জন্য। সেই থেকে পেইং গেস্ট হয়ে আছেন বন্ধুর বাড়িতে। বেশ ছিমছাম বাড়ি, মুনসেফীর আয় থেকে তারক বাগচী তৈরি করেছেন সিক্সটি ফোরে।

বৌ মারা গেছেন বছর তিনেক হল, একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, একমাত্র ছেলে চাকরি করে দেরাদুনে।

জায়গাটা যে মনোরম তাতে সন্দেহ নেই। এককালে রেশমের কুঠি ছিল করিমগঞ্জে। সেই সূত্রেই ম্যাকেঞ্জি সাহেবের পূর্বপুরুষ এখানে বাসা বেঁধেছিল। কুঠি উঠে গেছে একশো বছর আগে। কিন্তু ম্যাকেঞ্জিরা করিমগঞ্জের মায়া কাটাতে পারেননি। শেষ সাহেব জন ম্যাকেঞ্জিও হয়ত থেকেই যেতেন, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল। ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় পশমের ব্যবসা করে, সে-ই বাপকে চিঠি লিখে দেশে আনিয়ে নেয়।

বন্ধুর সঙ্গে নিশিকান্তবাবুর একটা ব্যাপারে বেমিল। তারক বাগচী ঘরকুনো মানুষ, কাজের পর বাড়িতে এসে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দেন, আর নিশিকান্তবাবুর হেঁটে বেড়ানোর অভ্যাস, বাত সত্ত্বেও সকালে সন্ধে মাইল দু'এক না হাঁটলে তাঁর ভাত হজম হয় না। করিমগঞ্জে আসার দিন তিনেকের মধ্যেই বেড়ানোর পথে

ম্যাকেঞ্জি সাহেবের পরিত্যক্ত বাংলোটা চোখে পড়ল তাঁর। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আড়াই বিঘে জমির মাঝখানে ছবির মতো একতলা বাংলো, খাপরা দেওয়া ঢালু ছাত, সামনে পিছনে বারান্দা, চারদিক ঘিরে গাছপালা। নিশিকান্তবাবু গাছপালা ভালবাসেন, বটানি তাঁর প্রিয় সাবজেক্ট ছিল কলেজে, বহরমপুরের বাড়িতে তাঁর নিজেরও একটি ছোট্ট বাগান ছিল। তার উপর অনুসন্ধিৎসা তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ অঙ্গ। এত বিচিত্র রকমের গাছ দেখে তিনি আর লোভ সামলাতে পারেন-নি। ১০ই কার্তিক ১৩৮৭—তারিখটা জরুরী—তিনি বন্ধুর নিষেধ অমান্য করে কাপড় হাঁটুর উপর তুলে পাঁচিলের একটি ভাঙা অংশ টপকে ঢুকে পড়লেন ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে।

আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারকেল ইত্যাদি যাবতীয় দেশী গাছ ছাড়াও, ছবিতে এবং শিবপুরের বোট্যানিক্যাল গার্ডেনে দেখা কিছু বিদেশী গাছও চোখে পড়ল নিশিকান্তবাবুর। ফুলগাছ যা ছিল তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আগাছায় ভরে আছে চতুর্দিক। তারই মধ্যে দিয়ে এক অদম্য কৌতূহলে গাছপালা দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন নিশিকান্তবাবু।

বাগানের মধ্যে দিয়ে পাথরে বাঁধানো পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আশে-পাশে ছড়ানো রয়েছে শ্বেতপাথরের স্ট্যাচু, লোহার বেঞ্চি, জল শুকিয়ে যাওয়া ফোয়ারা। শৌখিন লোক ছিলেন ম্যাকেঞ্জিরা তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলোর পিছন দিকটায় পৌঁছে গন্ধটা পেলেন নিশিকান্তবাবু। কোনো ফুল কিম্বা ফলের গন্ধ। তবে চেনা নয়। স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধ।

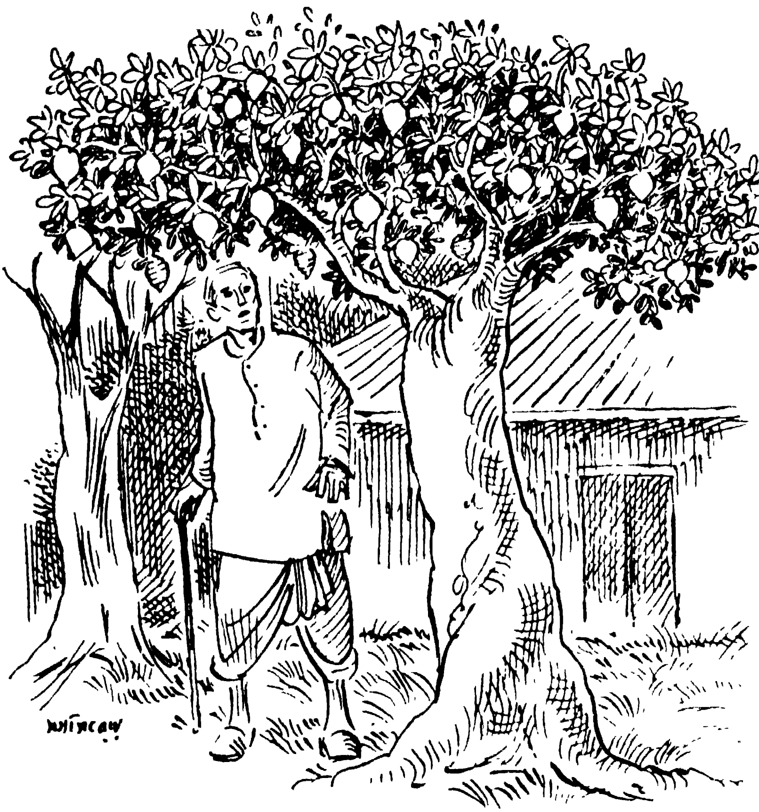
নিশিকান্তবাবু এগিয়ে গেলেন অনুসন্ধান করতে। শরৎকালের দিন ছোট হয়ে এসেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নেমে পড়বে। গন্ধের কারণটা কী সেটা তার আগেই জানা দরকার।

একটা সিংহের মূর্তি পেরিয়ে তিন পা যেতেই নিশিকান্তবাবুকে থেমে যেতে হল। সামনে বাঁয়ে একটা করবী গাছ, তার ঠিক পিছনে একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় একটা অচেনা গাছের গায়ে পশ্চিম দিক থেকে ঢলে পড়া সূর্যের রশ্মি এসে পড়ে তার একটা দিককে যেন সোনার পাতে মুড়ে দিয়েছে।

নিশিকান্তবাবু এগিয়ে গেলেন গাছটার দিকে। গন্ধ যে এই গাছটা থেকেই আসছে তাতে সন্দেহ নেই। গাছের ফল থেকে। সাদা রঙের ফল। ওপর দিকটা গোল। তলাটা ঈষৎ ছুঁচোল। গোল অংশটার ব্যাস একটা মাঝারি সাইজের কমলা-লেবুর মতো। গাছের পাতাগুলোও লক্ষ করলেন নিশিকান্তবাবু। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে শেখা বটানির কিছু নামও মনে পড়ে গেল। পাতার রঙ গাঢ় সবুজ, কম্পাউন্ড লীফ, অবলং, সেরেট। গাছটা দেড় মানুষ উঁচু। ফলের সংখ্যা কম করে পঞ্চাশ। তাদের গা থেকে সোনালি রোদ ক্রমে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ফলের রঙটার যেন একটা নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য আছে, যাতে মনে হয় অন্ধকার হবার পরও সেগুলো চোখ টানবে।

প্রায় মিনিট দশেক ধরে গাছটার এদিক ওদিক ঘুরে অবশেষে নিশিকান্ত-বাবুর মায়া কাটাতে হল। পোকামাকড় সরীসৃপের অভাব নেই এই পরিত্যক্ত বাগানে। এইবেলা বেরিয়ে পড়া দরকার। খালি হাতে ফিরবেন কি? না। এই অভিনব গাছের একটি ফল সঙ্গে নেওয়া দরকার।

নিশিকান্তবাবু হাত বাড়িয়ে একটি ফল ছিঁড়ে নিয়ে বাড়িমুখো হলেন।



তারকবাবু ফলটা দেখে নিশিকান্তবাবুর মতো না হলেও, খানিকটা বিস্মিত হলেন বৈকি।

'এ আবার কী আনলে সঙ্গে করে?

নিশিকান্তবাবু বললেন। তারকবাবু ফলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'এ জিনিস ত কস্মিনকালে দেখিনি হে। অস্ট্রেলিয়ার ফলই হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু সেটা সঠিক জানা যায় কি করে বল ত?'

ফলের নাম না জানা অবধি নিশিকান্তবাবুর শান্তি নেই।

'তুমি জ্ঞানবাবুকে দেখাও গিয়ে', বললেন তারক বাগচী। 'ওঁর দেশ-বিদেশে অনেক ঘোরা আছে। দেখ উনি যদি চিনতে পারেন।'

জ্ঞানবাবু অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশ চৌধুরী। চৌধুরীরা করিমগঞ্জের জমিদার ছিলেন। জ্ঞানপ্রকাশের ছিল ভ্রমণের নেশা। এখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি। তবে যুবা বয়সে যখন জমিদারী উচ্ছেদ হয়নি তখন বাপের পয়সায় অনেক ঘুরেছেন। অনেক দেশের অনেক কিছু জিনিস সংগ্রহ করে এনে বাড়ি ভরিয়ে ফেলেছেন।

নিশিকান্তবাবু তাঁর বন্ধুর কথামতো ফলটি থলিতে ভরে নিয়ে গেলেন জ্ঞান চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোক তখন তাঁর বৈঠকখানায় বসে কলের গান শুনছেন। আজকাল ভদ্রলোকের নেশা পুরোন বাংলা গানের রেকর্ড আর ডাকটিকিটে এসে দাঁড়িয়েছে। চৌধুরীমশাই হালফ্যাশানের রেকর্ডপ্লেয়ারে বিশ্বাস করেন না। তাঁর গ্রামোফোনের চোঙা আছে, এবং সেটি হাতে ঘুরিয়ে দম দিয়ে চালাতে হয়। কাজেই কলের গান বলাটাই ঠিক।

তিন মিনিটের রেকর্ড—জোহরা বাঈ-য়ের গান—শেষ হতে চাবি টিপে মেশিন বন্ধ করে ভদ্রলোক নিশিকান্তবাবুকে বসতে বললেন। হাতের ফলটা থলি থেকে বার করে শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর রেখে পাশের সোফায় আসন গ্রহণ করলেন নিশিকান্তবাবু।

'ওটা আবার কী?'

জ্ঞানবাবুর দৃষ্টি ফলের দিকে।

নিশিকান্তবাবু নম্রভাবে বললেন, 'আজ্ঞে ওটার জনাই আপনার কাছে আসা। এই ফলটা পেয়েছি ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে, কিন্তু কী ফল সেটা বুঝতে পারছি না। আপনি ত অনেক ঘুরেছেন-টুরেছেন, তাই...

'দেখি।'

নিশিকান্তবাবু ফলটা দিলেন চৌধুরীমশাইয়ের হাতে। সেটাকে নেড়েচেড়ে শুঁকেটুকে দেখে মাথা নাড়লেন জ্ঞান চৌধুরী।

'উঁহু। এ ফল ত দেখছি আমার অজানা। আপনি বরং কোনো বটানিস্টকে জিগ্যেস করুন। প্রেসিডেন্সির বটানির অধ্যাপক এখন বোধ করি বিনয় সোম। সেদিন কাগজে যেন দেখলাম নামটা। সে যদি বলতে পারে।'

নিশিকান্তবাবু চিন্তায় পড়লেন। তাঁকে কি তাহলে কলকাতায় যেতে হবে এই ফল নিয়ে?

'আপনি এক কাজ করুন',—তাঁর চিন্তাটা আঁচ করেই যেন বললেন জ্ঞান চৌধুরী—'আমার মেজো ছেলের পোলারয়েড ক্যামেরা আছে। সে আপনাকে ফল-সমেত গাছের রঙীন ছবি তুলে দেবে। তারই এক কপি আপনি সোমকে পাঠিয়ে দিন। তারপর দেখুন কী বলে?'

মেজো ছেলে জ্যোতিপ্রকাশ চৌধুরী ক্যানাডায় প্রোফেসারি করেন, সম্প্রতি বিয়ে করতে এসেছেন করিমগঞ্জে। তিনি খুশি হয়েই তাঁর ক্যামেরায় এই অজানা গাছের ছবি তুলে দিলেন। নিশিকান্তবাবু অবাক হয়ে দেখলেন ক্যামেরার শাটার টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটি সাদা কাগজ সড়াৎ করে ক্যামেরার গায়ে একটি খাঁজের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর চোখের সামনে এক মিনিটের মধ্যে ভেলকির মতো সেই কাগজে গাছের রঙীন ছবি ফুটে বেরোল। জ্যোতিপ্রকাশ ছবিটা ছিঁড়ে নিশিকান্তবাবুকে দিয়ে দিলেন।

ছবিটা হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করে নিশিকান্তবাবু বললেন, 'একটা ছবি, যদি হারিয়ে টারিয়ে যায়..

জ্যোতিপ্রকাশ বিনা বাক্যব্যয়ে আরো দুখানা ছবি তুলে দিলেন নিশিকান্ত-বাবুকে।

ছবির সঙ্গে তাঁর কলেজলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে নিশিকান্তবাবু গাছের একটি বর্ণনা দিয়ে প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক বিনয় সোমের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সাত দিনের মধ্যে উত্তর এসে গেল।

বিনয় সোম জানালেন এমন গাছ তিনি কখনো দেখেননি।

কিন্তু নিশিকান্তবাবু সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বর্ণনা সমেত আরেকটি ছবি তিনি পাঠালেন ইংল্যান্ডের রয়েল বোট্যানিক্যাল সোসাইটিতে। জ্ঞানবাবুর বাড়িতেই 'হুইটেকারস অ্যালম্যান্যাক' ছিল, তাতেই পাওয়া গেল সোসাইটির ঠিকানা। উত্তর আসতে লাগল তিন সপ্তাহ।

সোসাইটির পক্ষ থেকে মর্টিমার সাহেব জানিয়েছেন যে ফল সমেত গাছের যে ছবি পাঠানো হয়েছে তাতে যদি কোনো কারচুপি না থাকে তাহলে বলতেই হবে যে গাছটির জাত অজ্ঞাত।

এরপর যেটা ঘটল তাতে নিশিকান্তবাবুর চরিত্রের আরেকটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সেটা হল তাঁর ভাবুক দিক। একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে নিশিকান্তবাবু ভাবলেন —এই যে মানুষ এতরকম শাকসব্জি ফলমূল শস্যকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করছে, এর শুরু হল কবে? আম জাম কলা কমলা পেঁপে পেয়ারা এসব কে বা কারা প্রথম খেলো, এ কথা ত ইতিহাসে লেখে না। অমুক ফল সুস্বাদু, অমুক খাদ্য পুষ্টিকর—এসব কে কবে আবিষ্কার করল? এর মধ্যে এমনও ত অনেক কিছু আছে যা মানুষের খাদ্য নয়, যা খেলে মানুষের অনিষ্ট হতে পারে। কয়েক শ্রেণীর ব্যাঙের ছাতা আছে যা মানুষের পক্ষে মারাত্মক। সেটা যে খাওয়া চলে না সেটাও ত একদিন মানুষকে খেয়েই বুঝতে হয়েছিল!

শাস্ত্রে যাবতীয় খাদ্যের গুণাগুণ লেখা আছে, কিন্তু শাস্ত্র লেখা হয়েছে এই ত সেদিন--মানুষ সভ্য হবার অনেক পরে। তার লক্ষ লক্ষ বছর আগেই ত সে সব খাদ্য মানুষ খেতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিহাসে এমন একটিও নজির আছে কি যেখানে বলা হয়েছে অমুক ফল অমুক শস্য আজ প্রথম অমুক ব্যক্তি খেয়ে সেটাকে খাদ্য বলে প্রমাণ করল?

এইসব চিন্তা থেকেই নিশিকান্তবাবু একদিন স্থির করলেন যে এই নতুন ফল—যার নাম তিনি দিয়েছেন ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট—তাঁকে খেয়ে দেখতে হবে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি বন্ধুকে কিছু বললেন না। কারণ বললে তিনি হয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করবেন, না হয় হাঁ হাঁ করে উঠবেন। দুটোর কোনোটাই নিশিকান্তবাবু চান না।

এই সিদ্ধান্ত নেবার পরদিনই নিশিকান্তবাবু প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে সোজা চলে গেলেন ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে।

মনে একটা সংশয় ছিল যে দেখবেন গাছে ফল নেই, সব ঝরে পড়েছে, কিন্তু গিয়ে দেখলেন ফলের সংখ্যা আগের দিনের চেয়েও বেশি। নিশিকান্তবাবু ঝোলা নিয়ে গিয়েছিলেন, টস্‌টসে দেখে তিনটি ফল পেড়ে তাতে পুরে বাড়িমুখো হলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন তাঁর হৃৎস্পন্দনের মাত্রা সাধারণ অবস্থার চেয়ে বেশ খানিকটা দ্রুত। আজ তিনি যা করতে চলেছেন সেটা পৃথিবীতে আর কেউ কোনোদিন করেনি।

কিন্তু তাই কি?

গাছটা ত ছিল ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে। তিনি নিজে কি এ ফল কোনোদিন খেয়ে দেখেননি?

এই নতুন প্রশ্নটা সাময়িকভাবে নিশিকান্তবাবুর সমস্ত উৎসাহকে ব্লটিং

পেপারের মতো শুষে নিল। কে দিতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর? ম্যাকেঞ্জি সাহেবের সঙ্গে করিমগঞ্জের কারুর ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা সেটা আগে জানা দরকার, তারপর ফল ভক্ষণ!

উত্তর মিলল তারকবাবুর কাছে।

'ম্যাকেঞ্জি বিশেষ মিশতেন টিশতেন না কারুর সঙ্গে', বললেন তারকবাবু। 'তবে শিবশরণ উকীলের সঙ্গে সাহেবকে ঘুরতে দেখেছি বার কয়েক। বোধ হয় সাহেবের কোনো মামলার সূত্রে দুজনের আলাপ হয়।'

শিবশরণ মিত্র ব্যাপারটাকে অনেক সহজ করে দিলেন। বললেন, 'মামলা নয়। তাঁরও বাগানের শখ, আমারও বাগানের শখ, আর এই সূত্রেই আমাদের আলাপ। তেতাল্লিশ রকম গোলাপ ছিল আমার বাগানে। সাহেব দেখে খুব তারিফ করেছিলেন।'

নিশিকান্তবাবু ভরসা পেয়ে ঝোলা থেকে ফল বার করলেন।

'এই ফল কি ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে দেখেছেন কখনো?'

শিবশরণবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল।

'সাহেবের বাগানে ছিল এই ফল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোনখানটায়?'

নিশিকান্তবাবু বর্ণনা দিলেন।

'কাছাকাছি একটা বাজে-ঝলসানো আমলকী গাছ আছে কি?' প্রশ্ন করলেন শিবশরণবাবু।

তা আছে। মনে পড়েছে নিশিকান্তবাবুর। এই অজানা গাছটার পুব দিকে হাত দশেক দূরে।

'তার মানে মেমসাহেব যেখানে মারা গিয়েছিলেন ঠিক সেইখানেই এই গাছ,' বললেন শিবশরণ উকীল। 'তবে সাহেব থাকাকালীন এ গাছ ছিল না। থাকলে আমার চোখে পড়ত। ও বাগানে সাহেবের সঙ্গে অনেক ঘুরিচি আমি।'

হাঁফ ছাড়লেন নিশিকান্তবাবু। পায়োনীয়ার হবার পথে তাঁর আর কোনো বাধা নেই। তিনিই হবেন ম্যাকেঞ্জি ফ্রুটের প্রথম ভক্ষক।

সেই রাত্তিরে নিতাই ঠাকুরের রান্না চচ্চড়ি, মুসুরির ডাল, লাউঘণ্ট আর ট্যাংরা মাছের ঝোল খেয়ে বন্ধুর সঙ্গে উত্তরের বারান্দায় বসে আধ ঘণ্টা খানেক গল্প করে নিশিকান্তবাবু চলে এলেন নিজের ঘরে। বিকেল থেকেই মেঘ করেছিল, দশটা নাগাদ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বেশ জাঁকিয়ে বৃষ্টি নামল। নিশিকান্তবাবু ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কুঁজো থেকে এক গেলাস জল ঢেলে নিয়ে খাটের পাশে টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর একটি ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট হাতে নিয়ে দেয়ালে টাঙানো পরমহংসদেবের ছবিটা উদ্দেশ করে একটা নমস্কার ঠুকে শরীরটাকে টান করে হাতের ফলে কামড় দিলেন।

বার তিনেক চিবোবার পর ফলের রস খাদ্যনালীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝলেন এ একেবারে দেবভোগ্য ফল। এর সঙ্গে অন্য কোনো ফলের সাদৃশ্য নেই। তুলনাও নেই।

একটি আস্ত ফল শেষ করতে পাঁচ মিনিট লাগল নিশিকান্তবাবুর। তখন রাত পৌনে এগারটা। ঘুমোনর কোনো প্রশ্ন ওঠে না। একে ত আবিষ্কারের উত্তেজনা, তার উপর একটা সংশয় আছে—ফলে যদি কোনো অনিষ্ট হয় সেটা

হয়ত রাতারাতিই জানা যাবে।

নিশিকান্তবাবু ঘন ঘন নিজের নাড়ী টিপে দেখতে লাগলেন। চেহারায় কোনো অনিষ্টের ছাপ পড়ছে কিনা জানার জন্য আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর দেয়ালে টাঙানো আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। শেষটায় মাঝরাতেই ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পায়চারি করে শরীরের মাংসপেশীগুলো সব ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করে দেখলেন।

পাঁচটার ঠিক পরে যখন ভোরের প্রথম পাখি ডাকতে শুরু করেছে, তখন নিশিকান্তবাবু উপলব্ধি করলেন যে তাঁর কোমরের বাত সম্পূর্ণ সেরে গেছে, এবং এমন সুস্থ তিনি গত ত্রিশ বছরের মধ্যে কখনো বোধ করেননি।

॥ ২ ॥

ম্যাকেঞ্জি ফলের এই আশ্চর্য স্বাদ তিনি একাই ভোগ করবেন এটা নিশিকান্তবাবুর কাছে ন্যায্য বলে মনে হল না। সেই সঙ্গে তিনিই যে ফলের সন্ধান পেয়েছেন এবং তিনিই যে প্রথম এই ফল খেয়ে দেখেছেন সেটাও ত জানানো দরকার। বন্ধুর এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই সেটা নিশিকান্তবাবু ভালোভাবেই জানেন। ব্যাপারটা কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তির গোচরে আনা উচিত এটা মনে করে জ্ঞান চৌধুরীর নামটাই সবচেয়ে আগে মনে পড়ল। মানুষে মানুষে রুচিভেদ হয় এটা নিশিকান্তবাবু জানেন, কিন্তু এমন সুস্বাদু ফল কারুর খারাপ লাগতে পারে এটা যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই একটি ফল সঙ্গে নিয়ে তিনি গেলেন চৌধুরী নিবাসে।

বৈঠকখানায় জ্ঞানবাবুর সঙ্গে একটি অবাঙালী ভদ্রলোককে দেখে কিছুটা দমে গেলেও, নিশিকান্তবাবু ভণিতা না করে তাঁর আসার কারণটা জানিয়ে দিয়ে থলি থেকে ফলটা বার করে চৌধুরী মশায়ের সামনে টেবিলের উপর রাখলেন।

'নাম জানলেন এ ফলের?' জ্ঞান চৌধুরী প্রশ্ন করলেন। নিশিকান্তবাবু জানালেন রয়্যাল বোট্যানিক্যাল সোসাইটি পর্যন্ত ছবি দেখে ফলটাকে চিনতে পারেনি।—'আপনি খেয়ে দেখুন, অতি সুস্বাদু ফল।'

জ্ঞানবাবু আপত্তি করলেন না, তবে কামড় দিয়ে না খেয়ে চাকরকে ডেকে ছুরি আর দুটো প্লেট আনিয়ে নিজে এক টুকরো নিয়ে এক টুকরো দিলেন অন্য ভদ্রলোকটিকে। খাওয়ার পর দুজনের মুখের ভাব দেখে নিশিকান্তবাবুর মন খুশিতে ভরে গেল।

'এ যে অতি সুস্বাদু মশাই!' বললেন জ্ঞানবাবু।

'ওয়ান্ডারফুল!' বললেন অন্য ভদ্রলোকটি। 'ডিলিশাস! ইয়ে ফল কোথায় মিলল?'

নিশিকান্তবাবু সরল মনে সব কিছুই বলে দিলেন। এমনকি তাঁর বাত সেরে যাওয়ার ব্যাপারটা পর্যন্ত।

'ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট: একি আপনি দিলেন নাম?' অবাঙালী ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করলেন।

'নাম ত একটা দেওয়া দরকার', বললেন নিশিকান্তবাবু। 'এ ছাড়া আর কিছু মনে পড়ল না।'



নামটা যে বেশ জবরদস্ত হয়েছে সেটা দুই ভদ্রলোকই স্বীকার করলেন। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে দুজনকেই নমস্কার জানিয়ে নিশিকান্তবাবু বিদায় নিলেন।

চৌধুরী নিবাস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে নিশিকান্তবাবু ভারী প্রসন্ন বোধ করলেন। একটা কীর্তি রেখে যেতে চলেছেন তিনি। এমন যে হবে সেটা তাঁর এই বাষট্টি বছরের জীবনের ঘটনা থেকে কারুর বোঝার সাধ্য ছিল কি? না, ছিল না। মাঝারি মানুষের মাঝারি জীবন তাঁর। আর লক্ষ লক্ষ মাঝারি জীবনের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আজ তিনি অনন্য। শুধু বাঙালীদের মধ্যে নয়, নিজ-দেশবাসীদের মধ্যে নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে।

কিন্তু কীর্তির শেষ ত এখানেই না। এই ফল যদি দশজনের হাতে তুলে দেওয়া যায় তবেই না কীর্তি। ফলের ব্যাপক চাষ হলে দেশের লোকের যে কত উপকার হবে সেটা ভাবতেই নিশিকান্তবাবুর বুক দশহাত হয়ে গেল। ফলের বীজ ত আছে তাঁর কাছে! হালকা বেগুনী শাঁসের ভিতর কালো রঙের বীজ। সেটা পুঁতলে গাছ হবে না কি? তাঁর বাড়ির পিছনদিকে লাউ মাচার পাশে ত খানিকটা জমি রয়েছে। সেখানে পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কী?

কিন্তু সে-গুড়ে বালি। বীচি পুঁতে জলটল দিয়ে কোন ফল হল না। সাত-দিন অপেক্ষা করেও অঙ্কুরের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলেন না নিশিকান্তবাবু।

ইতিমধ্যে ফলের আশ্চর্য গুণের আরো পরিচয় পেয়েছেন তিনি। পড়শী

অবনী ঘোষের আট বছরের ছেলে ভুতো তাঁর কাছে মাঝে মাঝে অংক দেখাতে আসে। তার ফ্যারিনজাইটিস সেরে গেছে ফল খেয়ে। পাড়ার একটা ঘেয়ো কুকুর তারকবাবুর বাড়ির রাস্তার দিকের বারান্দার সামনে এসে রোজ ঘুর ঘুর করে। নিশিকান্তবাবু তাকে ফলের একটা টুকরো খেতে দেওয়ায় দুদিন পরে দেখলেন তার ঘা শুকিয়ে গেছে। এমনকি বন্ধুকে না বলে তার চায়ে এক চামচ ম্যাকেঞ্জির রস মিশিয়ে দেওয়ার ফলে ভদ্রলোকের দশদিনের বসা সর্দি একদিনে হাওয়া।

কিন্তু শুধু করিমগঞ্জের লোকেরাই ফলের কথা জানবে, বাইরের আর কেউ জানবে না, এটা কি হয়? জ্যোতিপ্রকাশবাবুর তোলা একটা ছবি এখনো আছে নিশিকান্তবাবুর কাছে। ইংরিজিতে ফুলস্ক্যাপের চার পাতা একটি প্রবন্ধ লিখে ছবি সমেত স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন তিনি। প্রবন্ধের নাম 'এ ওয়ান্ডারফুল নিউ ফ্রুট'। বলা বাহুল্য, তিনি নিজেই ফলের আবিষ্কর্তা সেটা বেশ পরিষ্কার ভাবে লিখে দিলেন নিশিকান্তবাবু। এ অবস্থায় আত্মপ্রচারের লোভটা সামলানো কি সহজ কথা?

সাতদিন বাদে একটি বছর পঁচিশেকের যুবক তাঁর বাড়িতে এল দেখা করতে। ইনি অঞ্জন সেনগুপ্ত, স্টেটসম্যানের রিপোর্টার। স্মার্ট চেহারা, চোখে পুরু চশমা, সঙ্গে ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডার। নিশিকান্তবাবু যে ফলটার কথা লিখেছেন সেটা সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়েছে তাকে।

নিশিকান্তবাবু খুশি হলেন। এই ত চাই। এটাই ত আশা করছিলেন তিনি।

'আমার লেখাটা যাচ্ছে ত?' নিশিকান্তবাবু প্রশ্ন করলেন।

'লেখার চেয়ে, মানে, সাক্ষাৎকারটা আজকাল লোকে পছন্দ করে বেশি,' বললেন অঞ্জন সেনগুপ্ত। 'ইয়ে, আমি কি গাছটা একবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন', বললেন নিশিকান্তবাবু, 'তবে মাইল খানেক হাঁটতে হবে।'

দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়লেন ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানের উদ্দেশ্যে। দিন দশেক যাওয়া হয়নি বাগানে। শেষ যেদিন গেছেন সেদিনও নিশিকান্তবাবু দেখে-ছেন গাছ ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। এ ফলের কি তাহলে 'সীজন' নেই? সারা বছরই কি গাছে ফল ফলে? যাবার পথে এইসব প্রশ্ন নিশিকান্তবাবুর মনে ঘুরছিল।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। যে বাগানে তিনি ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করেনি গত কয়েক মাস -এক ক্যামেরা নিয়ে জ্যোতিপ্রকাশ চৌধুরী ছাড়া—সেখানে আজ এত লোক কেন?

দুজন লোককে চিনতে পারলেন নিশিকান্তবাবু—জ্ঞানপ্রকাশ চৌধুরী ও তাঁর ঘরে সেদিন যে অবাঙালী ভদ্রলোকটি ছিলেন তিনি। আজ তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন জ্ঞানবাবু।

'এঁকে সেদিন দেখেছেন আপনি। ইনি হচ্ছেন চুনিলাল মানসুখানি। আপনার দেওয়া সেই ফলটি খেয়ে অবধি এনার মাথায় নানান ফন্দি খেলছে।'

'তাই বুঝি?'

নিশিকান্তবাবুর বুকের মধ্যে কেন জানি দুরু দুরু আরম্ভ হয়ে গেছে। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে সেটা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন।

'ওই ফলের চাষ করার ইচ্ছে মিঃ মানসুখানির। ব্যবসাদার মানুষ ত, নতুন

ব্যবসার সুযোগ পেলে ওঁকে সামলানো দায়।'

নিশিকান্তবাবু কথাটা না বলে পারলেন না।

'কিন্তু আমি বীজ পুঁতে দেখেছি। চারার কোনো লক্ষণ দেখিনি।'

মানসুখানি হেসে উঠলেন। 'গাছ শুধু এই বাগানের মাটিতেই জন্মায়। ওই দেখুন—সাতদিন আগে পোঁতা বীজে কেমন চারা গজিয়েছে।'

নিশিকান্তবাবু অবাক হয়ে দেখলেন আগের গাছটা থেকে হাত দশেক ডাইনে একটি সতেজ গাছের চারা, পাতা দেখে তাকে চিনতে কোনো অসুবিধা হয় না।

সাংবাদিক অঞ্জন সেনগুপ্ত জোর খবরের গন্ধ পেয়ে নিশিকান্তবাবুকে ছেড়ে মানসুখানিকে ধরেই ইন্টারভিউ করে নিয়ে গেলেন। নিশিকান্তবাবুর প্রবন্ধের বদলে সেই ইন্টারভিউটাই বেরোল কাগজে।

ছ'মাসের মধ্যে ম্যাকেঞ্জি ফলের গাছে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগান ভরে গেল। এক মাসের মধ্যে জ্ঞান চৌধুরীর সঙ্গে পার্টনারশিপে মানসুখানির ব্যবসা চালু হয়ে গেল। মাত্র একশো বাষট্টিটা গাছ। কিন্তু তা থেকে ফল পাওয়া যায় সারা বছর ধরে। ইতিমধ্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে জানা গেছে ফলে সাত রকম ভিটামিন আছে. এবং সেই সঙ্গে আরো এমন কিছু আছে যার সঙ্গে রাসায়নিকদের এখনো পরিচয় হয়নি।

স্বাদ গন্ধ উপকারিতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য ফলের দাম হল আকাশ-ছোঁয়া। এক একটি টিনে দু'টুকরো করে কাটা সংরক্ষক-রসে ভাসমান চারটি করে খোসা ছাড়ানো বীজবিহীন ফল। প্রতি টিনের দাম ভারতীয় টাকার হিসেবে সাড়ে তিনশো। দেশের লোক সে ফলের শুধু নামই শুনেছে, তাদের ঘরে সে ফল পেঁছায় না, কারণ সব ফল চলে যায় জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায়। ফলের খ্যাতি সারা বিশ্বে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানের বাইরে সে ফল গজানো সম্ভব হয়নি।

যেমন বাগানে, তেমনি করিমগঞ্জের লাগোয়া বীরসিংহপুরে, ফল যেখানে টিনে ভরা হয় সেই কারখানায় পুলিশের কড়া বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বাগানের চারিপাশ ঘিরে নতুন পাঁচিল উঠেছে, দেখে মনে হয় জেলখানার পাঁচিল। বাংলো ভেঙে মানসুখানিব ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট কোম্পানির আধুনিক অফিস তৈরি হয়েছে। রোজ সকাল ন'টায় জার্মান মার্সেডিজ গাড়িতে ভদ্রলোককে সেই অফিসে আসতে দেখা যায়। তাঁর কয়েকজন খুব কাছের লোকও মাঝে মাঝে সেখানে আসেন, আর যাবার সময় সঙ্গে একটি করে ফলের টিন নিয়ে যান কনসেশন রেটে। এ ছাড়া অফিসের কর্মীর বাইরে আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই।

আজ দেড় বছর হল এই ব্যবসা চালু হয়েছে। কিন্তু নিশিকান্তবাবুর হতভম্ব ভাবটা এখনো কাটেনি। অফিস খোলার দুদিন বাদে তিনি গিয়েছিলেন ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগান দেখতে। কিন্তু পুলিশ তাঁকে ঢুকতে দেয়নি। তিনি ভারী অবাক হয়ে বলেন, 'হাম্ নিশিকান্ত বোস হ্যায়—ইয়ে ফল হমারি আবিষ্কার হ্যায়—তুমহারা বাবুকো যাকে বোলো।' কিন্তু সশস্ত্র দ্বাররক্ষক তাঁর কথায় কান দেয়নি। জ্ঞান চৌধুরীর বাড়িতে গিয়েও কোনো লাভ হয়নি। তিনি এখন আর যার তার সঙ্গে দেখা করেন না।

তারক বাগচী অবশ্য এতদিনে সবই জেনেছেন। তিনি ভর্ৎসনার সুরে বন্ধুকে বলেন. 'তোমার বন্ধু উকীল. তুমি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে ফস্ করে কতগুলো

ব্যাপার করে বসলে—ধুরন্ধর লোকের মতিগতি তুমি বুঝবে কি করে? তোমাকে বোকা পেয়ে তারা যে লেঙ্গি মারবে এতে করে আশ্চর্য কী?'

তবে একটি ফল নিশিকান্তবাবুর কাছে রয়ে গিয়েছিল। বীরসিংহপুরে গিয়ে একটি খালি টিন তিনি সংগ্রহ করে এনেছিলেন অনেক কষ্টে। সেই ফল তার মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন। তাঁরই আবিষ্কার এই ফল, তিনিই প্রথম খেয়েছিলেন, তিনিই নামকরণ করেছিলেন ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট।

সেই আশ্চর্য ফল এই দেড় বছর পরে আজও টাট্‌কা রয়েছে।

অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু

টিপু ভূগোলের বইটা বন্ধ করে ঘড়ির দিকে দেখল। সাতচল্লিশ মিনিট পড়া হয়ে গেছে একটানা। এখন তিনটে বেজে তেরো মিনিট। এবার যদি ও একটু ঘুরে আসে তাহলে ক্ষতি কী? ঠিক এমনি সময় ত সেদিন লোকটা এসেছিল। সে ত বলেছিল টিপুর দুঃখের কারণ হলে তবে আবার আসবে। তাহলে? কারণ ত হয়েছে। বেশ ভালো রকমই হয়েছে। যাবে নাকি একবার বাইরে?

নাঃ। মা বারান্দায় বেরিয়েছেন কিসের জন্য জানি। হুস করে একটা কাগ তাড়ালেন এক্ষুনি। তারপর ক্যাঁচ শব্দটায় মনে হল বেতের চেয়ারটায় বসলেন। বোধহয় রোদ পোয়াচ্ছেন। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

লোকটার কথা মনে পড়ছে টিপুর। এমন লোক টিপু কোনোদিন দেখেনি। ভীষণ বেঁটে, গোঁফদাড়ি নেই, কিন্তু বাচ্চা নয়। বাচ্চাদের এমন গম্ভীর গলা হয় না। তাহলে লোকটা বুড়ো কী? সেটাও টিপু বুঝতে পারেনি। চামড়া কুঁচকোয়নি কোথাও। গায়ের রং চন্দনের সঙ্গে গোলাপী মেশালে যেমন হয় তেমনি। টিপু মনে মনে ওকে গোলাপীবাবু বলেই ডাকে। লোকটার আসল নাম টিপু জানে না। জানতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটা বলল, 'কী হবে জেনে? আমার নাম উচ্চারণ করতে তোমার জিভ জড়িয়ে যাবে।'

টিপু বেশ রেগে গিয়েছিল। 'কেন, জড়িয়ে যাবে কেন? আমি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলতে পারি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলতে পারি, এমনকি ফ্লক্‌সিনসিনিহিলিপিলি-ফিকেশন বলতে পারি, আর তোমার নাম বলতে পারব না?' তাতে লোকটা বলল, 'একটা জিভে আমার নাম উচ্চারণ হবে না।'

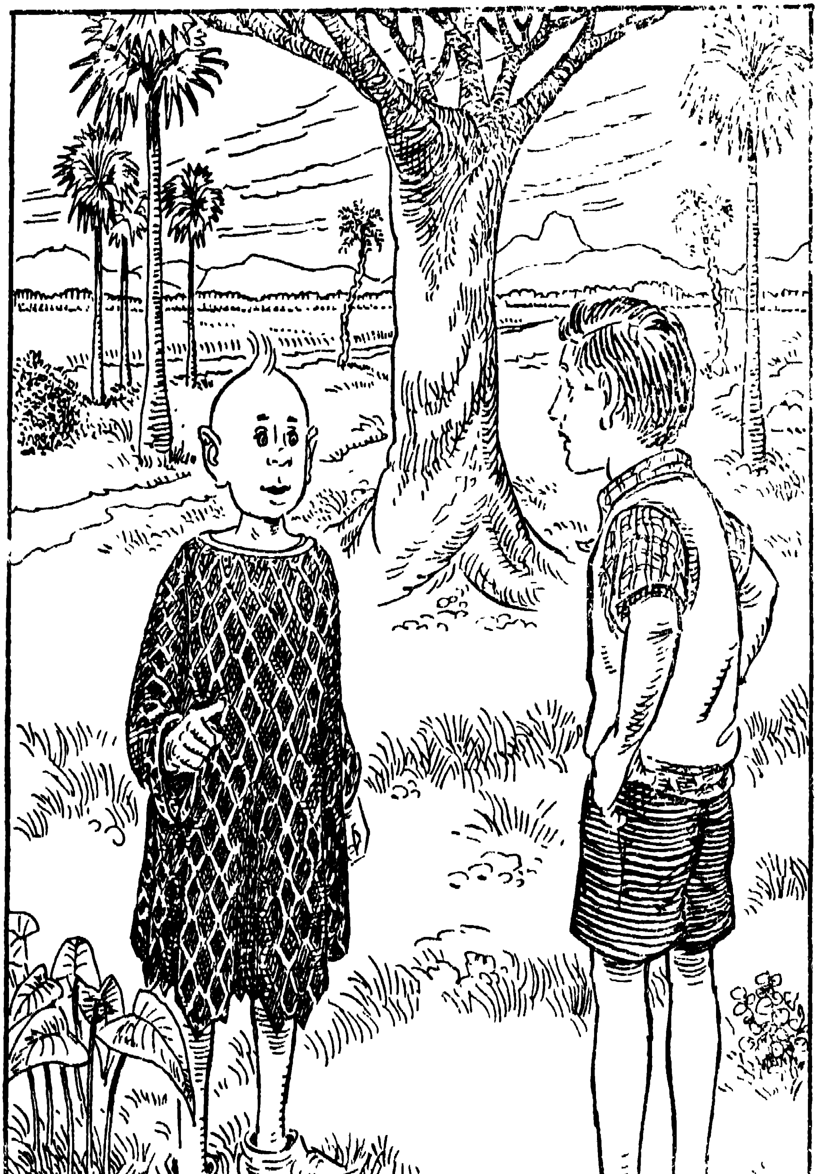
'তোমার বুঝি একটার বেশি জিভ আছে?' জিজ্ঞেস করেছিল টিপু।

'বাংলা বলতে একটার বেশি দরকার হয় না।'

বাড়ির পিছনে যে নেড়া শিরীষ গাছটা আছে, তারই নিচে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। এদিকটা বড় একটা কেউ আসে না। শিরীষ গাছটার পিছনে খোলা মাঠ, তারও পিছনে ধান ক্ষেত, আর তারও অনেক, অনেক পিছনে পাহাড়ের সারি। কদিন আগেই টিপু এদিকটায় এসে একটা ঝোপের ধারে একটা বেজিকে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছিল। আজ হাতে কিছু পাঁউরুটির টুকরো নিয়ে এসেছিল ঝোপটার ধারে ছড়িয়ে দেবার জন্য, যদি তার লোভে বেজিটা আবার দেখা দেয়। এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়ল গাছতলায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে। চোখাচুখি হতেই লোকটা ফিক্ করে হেসে বলল, 'হ্যালো'।

সাহেব নাকি? সাহেব হলে কথা বলে বেশিদূর এগোন যাবে না, তাই টিপু কিছুক্ষণ কিছু না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার লোকটাই ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'তোমার কোনো দুঃখ আছে?'

'দুঃখ?'



'দুঃখ।'

টিপু ত অবাক। এমন প্রশ্ন তাকে কেউ কোনদিন করেনি। সে বলল, 'কই, না ত। দুঃখ ত নেই।'

'ঠিক বলছ?'

'বা রে, ঠিক বলব না কেন?'

'তোমার ত দুঃখ থাকার কথা। হিসেব করে ত তাই বেরোল।'

'কি রকম দুঃখ? ভেবেছিলাম বোজিটাকে দেখতে পাব, কিন্তু পাচ্ছি না। সেরকম দুঃখ?'

'উঁহু উঁহু। যে-দুঃখে কানের পিছনটা নীল হয়ে যায়, হাতের তেলো শুকিয়ে যায়, সেরকম দুঃখ।'

'মানে ভীষণ দুঃখ?'

'হ্যাঁ।'

'না, সেরকম দুঃখ নেই।'

লোকটা এবার নিজে দুঃখ দুঃখ ভাব করে মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, তাহলে এখনো মুক্তি নেই।'

'মুক্তি?'

'মুক্তি। ফ্রীডম।'

'ফ্রীডম মানে মুক্তি সেটা আমি জানি,' বলল টিপু। 'আমার দুঃখ হলে বুঝি তোমার মুক্তি হবে?'

লোকটা টিপুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলল, 'তোমার বয়স সাড়ে দশ?'

'হ্যাঁ', বলল টিপু।

'আর নাম শ্রীমান তর্পণ চৌধুরী?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কোনো ভুল নেই।'

লোকটা যে ওর বিষয়ে এত খবর পেলো কোত্থেকে সেটা টিপু বুঝতে পারল না। টিপু বলল, 'শুধু আমার দুঃখ হলেই তোমার মুক্তি? আর কারুর দুঃখে নয়?'

'দুঃখে মুক্তি নয়, দুঃখ দূর করলে তবে মুক্তি।'

'কিন্তু দুঃখ ত অনেকের আছে। আমাদের বাড়িতে নিকুঞ্জ ভিখিরি এসে একতারা বাজিয়ে গান গায়। সে বলে তার তিন কুলে কেউ নেই। তার ত খুব দুঃখ।'

'তাতে হবে না,' লোকটা মাথা নেড়ে বলল। 'তর্পণ চৌধুরী, বয়স সাড়ে দশ— এখানে তুমি ছাড়া আর কেউ আছে?'

'বোধ হয় না।'

'তবে তোমাকেই চাই।'

এবার টিপু একটা কথা জিগ্যেস না করে পারল না।

'তুমি কিসের থেকে মুক্তির কথা বলছ? তুমি ত দিব্যি চলেফিরে বেড়াচ্ছ।'

'এটা আমার দেশ নয়। এখানে ত আমায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছে।'

'কেন?'

'অত জানার কী দরকার তোমার?'

'বা রে. একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হল, আর তার বিষয় জানতে ইচ্ছা

করবে না? তুমি কোথায় থাক, কী কর, কী নাম তোমার, আর কে কে চেনে তোমাকে—সব জানতে ইচ্ছা করছে আমার।'

'অত জানলে জিঞ্জিরিয়া হবে।'

লোকটা আসলে জিঞ্জিরিয়া বলেনি ; বলেছিল একটা ভীষণ কঠিন কথা যেটা টিপু চেষ্টা করলেও উচ্চারণ করতে পারবে না। তবে খুব সহজ করে বললে সেটা জিঞ্জিরিয়াই হয়। না জানি কী ব্যারামের কথা বলছে, তাই টিপু আর ঘাঁটাল না। কার কথা মনে হচ্ছে লোকটাকে দেখে? রামখেল তিলক সিং? নাকি ঘ্যাঁঘাসুরের সেই একহাত লম্বা লোকটা, যার সঙ্গে মানিকের দেখা হয়েছিল? নাকি স্নো হোয়াইটের সেই সাতটা বামুনের একটা বামুন? টিপু রূপকথার পোকা। তার দাদু প্রতিবারই পুজোয় কলকাতা থেকে আসার সময় তার জন্য তিন-চার-খানা করে রূপকথার বই এনে দেন। টিপুর মনটা সে সব পড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী ছত্রিশ পাহাড় পেরিয়ে কোথায় যেন উড়ে চলে যায়। সে নিজেই হয়ে যায় রাজপুত্তুর—তার মাথায় মুক্তো বসানো পাগড়ি, আর কোমরে হীরে বসানো তলোয়ার। কোনদিন চলেছে গজমোতির হার আনতে, কোনদিন ড্র্যাগনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

'গুড বাই।'

সে কি, লোকটা যে চলল!

'কোথায় থাক তুমি, বললে না?'

লোকটা তার প্রশ্নে কান না দিয়ে শুধু বলল, 'তোমার দুঃখ হলে তখন আবার দেখা হবে।'

'কিন্তু তোমায় খবর দেব কী করে?'

ততক্ষণে লোকটা এক লাফে একটা দেড় মানুষ উঁচু কুল গাছ টপ্‌কে হাইজাম্পে ওয়র্লড রেকর্ড করে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এটা প্রায় দেড়মাস আগের ঘটনা। তারপর থেকে লোকটা আর আসেনি। কিন্তু এখন ত আসা দরকার, কারণ টিপুর সত্যিই দুঃখের কারণ হয়েছে। আর সেই কারণ হল তাদের ইস্কুলের নতুন অঙ্কের মাস্টার নরহরিবাবু।

নতুন মাস্টারমশাইকে টিপুর এমনিতেই ভালো লাগেনি। প্রথমদিন ক্লাসে ঢুকে কিছু বলার আগে প্রায় দু'মিনিট খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সারা ক্লাসের ছাত্রদের উপর যেভাবে চোখ বোলালেন তাতে মনে হয় যেন আগে সকলকে ভস্ম করে তারপর পড়াতে শুরু করবেন। তাল গাছের হুসুর মুসুরের মতো এমন ঝাঁটা গোঁফ যে সত্যি-মানুষের হয় সেটা টিপু জানতই না। তার ওপর ওরকম মুখে-হাঁড়িধরা গলার আওয়াজ। ক্লাসের কেউই ত কালা নয়, তাহলে অত হুমকিয়ে কথা বলার দরকারটা কী?

আসল গোলমালটা হল দুদিন পরে, বিষ্যুদবারে। দিনটা ছিল মেঘলা, তার উপর পৌষ মাসের শীত। টিফিনের সময় টিপু ক্লাস থেকে না বেরিয়ে নিজের ডেস্কে বসে পড়ছিল ডালিমকুমারের গল্প। কে জানত ঠিক সেই সময়ই অঙ্কের স্যার ক্লাসের পাশ দিয়ে যাবেন, আর তাকে দেখতে পেয়েই ক্লাসে ঢুকে আসবেন?

'ওটা কী বই, তর্পণ?'

স্যারের স্মরণশক্তি যে সাংঘাতিক সেটা বলতেই হবে, কারণ দুদিনেই সব ছাত্রদের নাম মুখস্থ হয়ে গেছে।

টিপুর বুকটা দুরদুর করলেও, টিফিনে গল্পের বই পড়াটা দোষের নয় মনে

করে সে বলল 'ঠাকুরমার ঝুলি, স্যার।'

'কই দেখি।'

টিপু বইটা দিয়ে দিল স্যারের হাতে। স্যার মিনিট খানেক ধরে সেটা উল্টে-পালটে দেখে বললেন, 'হাঁউ মাউ কাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ, হীরের গাছে মোতির পাখি, শামুকের পেটে রাজপুত্তুর—এসব কী পড়া হচ্ছে শুনি? যত আজগুবি ধাপ্পাবাজি! এসব পড়লে অঙ্ক মাথায় ঢুকবে কেমন করে, অ্যাঁ?'

'এ ত গপ্প, স্যার,' টিপু কোনোরকমে গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে বলল।

'গপ্প? গপ্পর ত একটা মাথামুণ্ডু থাকবে, নাকি যেমন তেমন একটা লিখলেই হল?'

টিপু অত সহজে হার মানতে চাইছিল না। বলল 'রামায়ণেও ত আছে হনুমান জাম্বুমান, আর মহাভারতে বক রাক্ষস আর হিড়িম্বা রাক্ষসী আর আরো কত কী।'

'জ্যাঠামো কোর না', দাঁত খিঁচিয়ে বললেন নরহরি স্যার। 'ওসব হল মুনি-ঋষিদের লেখা, দুহাজার বছর আগে। সে ত গণেশ ঠাকুরেরও—মানুষের গায়ে হাতির মাথা, আর মা দুর্গার দশটা হাত। ও জিনিস আর তোমার এ মনগড়া গাঁজাখুরি গপ্প এক জিনিস নয়। তোমরা এখন পড়বে মনীষীদের জীবনী, ভালো ভালো ভ্রমণ কাহিনী, আবিষ্কারের কথা, মানুষ কী করে ছোট থেকে বড় হয়েছে সেই সব কথা। তোমাদের বয়সে বাস্তব কথার দাম হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তোমরা হলে বিংশ শতাব্দীর ছেলে। আদ্যিকালে পল্লীগ্রামে যে জিনিস চলত সে জিনিস আজ শহরে চলবে কী করে? এসব পড়তে হলে পাততাড়ি নিয়ে পাঠ-শালায় গিয়ে বসতে হবে, আর দুলে দুলে কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া মুখস্থ করতে হবে। সে সব পারবে তুমি?'

টিপু চুপ করে রইল। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত কথা শুনতে হবে সেটা ও ভাবতে পারেনি।

'ক্লাসে আর কে কে এসব বই পড়ে?' অঙ্ক স্যার জিগ্যেস করলেন।

সত্যি বলতে কি, আর কেউই প্রায় পড়ে না। শীতল একবার টিপুর কাছ থেকে হিন্দুস্থানী উপকথা ধার নিয়ে গিয়েছিল, পরদিনই ফেরত দিয়ে বলল, 'ধুস্, এর চেয়ে অরণ্যদেব ঢের ভালো।'

'আর কেউ পড়ে না স্যার', বলল টিপু।

'হুঁ।...তোমার বাবার নাম কী?'

'তারানাথ চৌধুরী।'

'কোথায় থাক তোমরা?'

'স্টেশন রোড। পাঁচ নম্বর।'

'হুঁ।'

বইটা ঠক্ করে ডেস্কের উপর ফেলে দিয়ে অঙ্ক স্যার চলে গেলেন।

ইস্কুলের পর টিপু সোজা বাড়ি ফিরল না। স্কুলের পুব দিকে ঘোষদের আম বাগানটা ছাড়িয়ে বিষ্ণুরাম দাসের বাড়ির বাইরে বাঁধা সাদা ঘোড়াটার দিকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইল জামরুল গাছটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। বিষ্ণুরামবাবুর বিড়ির কারখানা আছে। ঘোড়ায় চড়ে কারখানায় যান। বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু এখনো মজবুত শরীর।

টিপু প্রায়ই এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে দেখে, কিন্তু আজ আর কিছু

ভালো লাগছিল না। তার মন বলছে অঙ্ক স্যার তার গল্পের বই পড়া বন্ধ করার মতলব করছেন। গল্পের বই না পড়ে সে থাকবে কী করে? সারা বছরের একটা দিনও তার গল্পের বই পড়া বন্ধ থাকে না, আর সবচেয়ে ভালো লাগে ওইসব বইগুলো, যেগুলোকে অঙ্ক স্যার বললেন আজগুবি আর গাঁজাখুরি। কই, ও ত এসব বই পড়েও অঙ্কেতে কোনোদিন খারাপ করেনি! গত পরীক্ষায় পঞ্চাশে চুয়াল্লিশ পেয়েছিল। আর আগের অঙ্কের স্যার ভূদেববাবুর কাছে ত অঙ্কের জন্য কোনোদিন ধমক খেতে হয়নি!

শীতকালের দিন ছোট বলে এমনিতেই টিপু এবার বাড়ি ফিরবে ভাবছিল, এমন সময় একটা ব্যাপার দেখে ঝট্ করে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিতে হল।

অঙ্ক স্যার নরহরিবাবু বই ছাতা বগলে এদিকেই আসছেন।

তাহলে কি ওঁর বাড়ি এই দিকেই? বিষ্ণুরামবাবুর বাড়ির পরে আরো গোটা পাঁচেক বাড়ি আছে অবিশ্যি এ রাস্তায়। তারপরেই হামলাটুনির মাঠ। ওই মাঠের পুব দিকে এককালে রেশমের কুঠি ছিল। হ্যামিলটন সাহেব ছিলেন তার ম্যানেজার। ভয়ংকর কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন তিনি। বত্রিশ বছর ম্যানেজারি করে কুঠির পাশেই তাঁর বাংলোতে মারা যান। তাঁর নামেই ওই মাঠের নাম হয়ে গেছে হামলাটুনির মাঠ।

আলো পড়ে আসা পৌষ মাসের বিকেলে জামরুল গাছের আড়াল থেকে ও দেখছে নরহরি স্যারকে। ভারী অবাক লাগছে তাঁর হাবভাব দেখে। স্যার এখন বিষ্ণুরামবাবুর ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ঠোঁট ছুঁচোল করে চুক চুক্ শব্দ করে ঘোড়ার কাঁধে হাত বুলোচ্ছেন।

এমন সময় খুট্ করে বাড়ির সদর দরজা খোলার শব্দ হল, আর বিষ্ণুরামবাবু নিজেই চুরুট হাতে বেরিয়ে এলেন।

'নমস্কার।'

ঘোড়ার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে অঙ্ক স্যার বিষ্ণুরামবাবুর দিকে ফিরলেন। বিষ্ণুরামবাবুও নমস্কার করে বললেন, 'এক হাত হবে নাকি?'

'সেই জন্যেই ত আসা', বললেন অঙ্ক স্যার। তার মানে অঙ্ক স্যার দাবা খেলেন। বিষ্ণুরামবাবু যে খেলেন সেটা টিপু জানে। অঙ্ক স্যার এবার বললেন, 'দিব্যি ঘোড়াটি আপনার। পেলেন কোত্থেকে?'

'কলকাতা। শোভাবাজারের দ্বারিক মিত্তিরের ছিল ঘোড়াটা। ওনার কাছ থেকেই কেনা। রেসের মাঠে ছুটেছে এককালে। নাম ছিল পেগ্যাসাস।'

পেগ্যাসাস? নামটা যেন চেনা চেনা মনে হল টিপুর, কিন্তু কোথায় শুনেছে মনে করতে পারল না।

'পেগ্যাসাস' বললেন অঙ্ক স্যার। 'কিম্ভুত নাম ত মশাই।'

'ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার ওই রকমই নাম হয়। হ্যাপি বার্থডে, শোভান আল্লা, ফরগেট-মি-নট...'

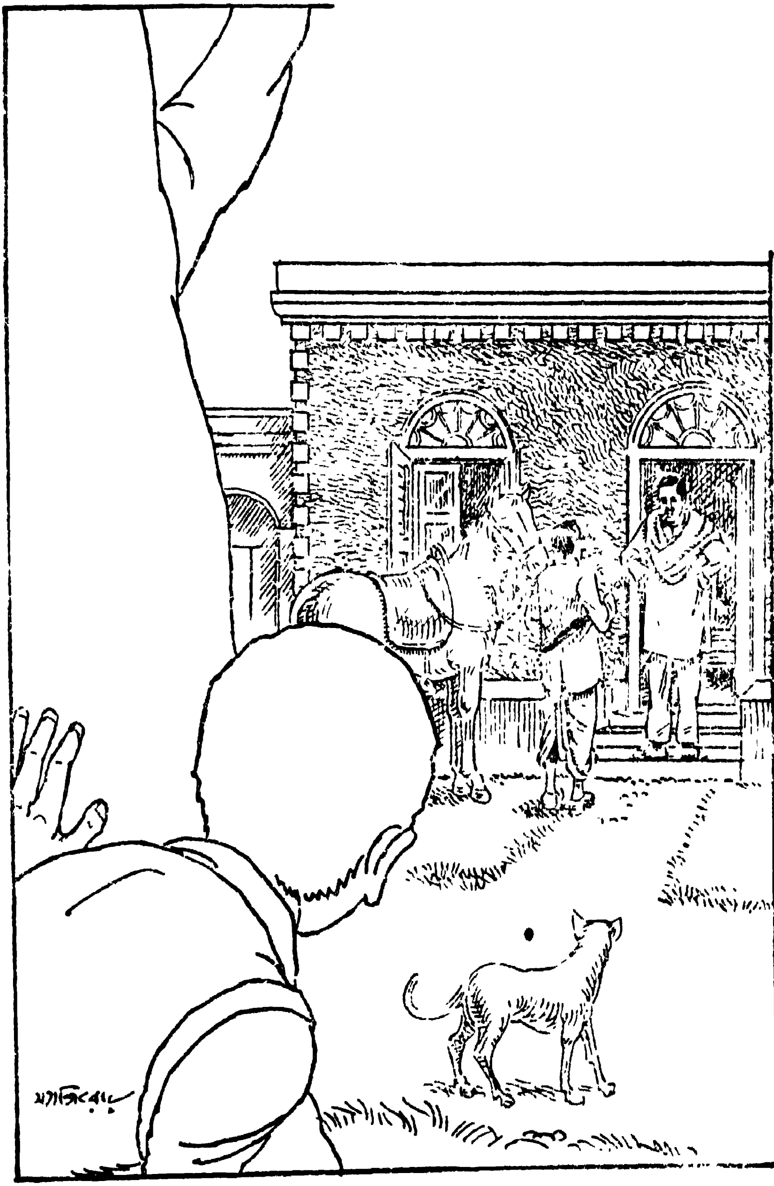
'আপনি চড়েন এ ঘোড়া?'

'চড়ি বৈকি। তালেবর ঘোড়া। একটি দিনের জন্যেও বিগড়োয়নি।'

অঙ্ক স্যার চেয়ে আছেন ঘোড়াটার দিকে। বললেন, 'আমি এককালে খুব চড়েচি ঘোড়া।'

'বটে?'

'তখন আমরা শেরপুরে। বাবা ছিলেন ডাক্তার। ঘোড়ায় চেপে রুগী দেখতে



যেতেন। আমি তখন ইস্কুলে পড়ি। সুযোগ পেলেই চড়তুম। ওঃ, সে কি আজকের কথা!'

'চড়ে দেখবেন এটা?'

'চড়ব?'

'চড়ুন না।'

টিপু অবাক হয়ে দেখল অঙ্ক স্যার হাত থেকে বই ছাতা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে ঘোড়ার দড়িটা খুলে এক ঝটকায় সেটার পিঠে চড়ে বসলেন। তারপর বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পাশে দুবার চাপ দিতেই সেটা খট্ খট্ করে চলতে আরম্ভ করল।

'দেখবেন, বেশিদূর যাবেন না', বললেন বিষ্ণুরামবাবু।

'আপনি ঘুঁটি সাজান গিয়ে', বললেন অঙ্ক স্যার, 'আমি খানিকদূর গিয়েই ঘুরে আসছি।'

টিপু আর থামল না। আজ একটা দিন গেল বটে!

কিন্তু ঘটনার শেষ এখানেই নয়।

তখন সন্ধ্যা সাতটা। টিপু পরের দিনের পড়া শেষ করে সবে ভাবছে এবার গল্পের বইটা খুলবে কিনা, এমন সময় বাবা ডাক দিলেন নিচ থেকে।

টিপু নিচে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখে নরহরি স্যার বসে আছেন বাবার সঙ্গে। টিপুর রক্ত হিম হয়ে গেল। বাবা বললেন, 'তোমার দাদুর দেওয়া যে বইগুলো রয়েছে সেগুলো ইনি একবার দেখতে চাইছেন। যাও ত নিয়ে এস গিয়ে।'

টিপু নিয়ে এল। সাতাশ খানা বই। তিন খেপে আনতে হল।

অঙ্ক স্যার ঝাড়া দশ মিনিট ধরে বইগুলো দেখলেন। মাঝে মাঝে মাথা নাড়েন আর হুঁঃ করে একটা শব্দ করেন। তারপর বইগুলো রেখে দিয়ে বললেন—

'দেখুন মিস্টার চৌধুরী, আমি যেটা বলছি সেটা আমার অনেক দিনের চিন্তা-গবেষণার ফল। ফেয়ারি টেইল বলুন আর রূপকথাই বলুন আর উপকথাই বলুন, এর ফল হচ্ছে একই—ছেলেমেয়েদের মনে কুসংস্কারের বীজ বপন করা। শিশুমনকে যা বোঝাবেন তাই তারা বুঝবে। সেখানে আমাদের বড়দের দায়িত্বটা কতখানি সেটা একবার ভেবে দেখুন! আমরা কি তাদের বোঝাব, বোয়াল মাছের পেটে থাকে মানুষের প্রাণ?—যেখানে আসল কথাটা হচ্ছে যে প্রাণ থাকে মানুষের হৃৎপিণ্ডে—তার বাইরে কোথাও থাকতে পারে না, থাকা সম্ভব নয়।'

বাবা পুরোপুরি কথাটা মানছেন কিনা সেটা টিপু বুঝতে না পারলেও, এটা সে জানে যে ইস্কুলের মাস্টারদের কথা যে মেনে চলতে হয়, এটা তিনি বিশ্বাস করেন। 'ছেলে বয়সটা মেনে চলারই বয়স, টিপু', এ কথা বাবা অনেকবার বলেছেন। 'বিশেষ করে গুরুজনদের কথা মানতেই হবে। নিজের ইচ্ছে মতো সব কিছু করার বয়সও আছে একটা, কিন্তু সেটা পড়াশুনো শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর। তখন তোমাকে কেউ বলবে না এটা কর, ওটা কর। বা বললেও, সেখানে তোমার নিজের মতটা দেবার অধিকার আছে। কিন্তু সেটা এখন নয়।'

'আপনার বাড়িতে অন্য ধরনের শিশুপাঠ্য বই নেই?' জিগ্যেস করলেন নরহরি স্যার।

'আছে বৈকি', বললেন বাবা। 'আমার বুক শেলফেই আছে। আমার ইস্কুলে প্রাইজ পাওয়া বই। টিপু তুই দেখিস্নি?'

'সব পড়া হয়ে গেছে বাবা', বলল টিপু।

'সবগুলো?'

'সবগুলো। বিদ্যাসাগরের জীবনী, সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী, ক্যাপ্টেন স্কটের দাক্ষিণ মেরু অভিযান, মাঙ্গো পার্কের আফ্রিকা ভ্রমণ, ইস্পাতের কথা, আকাশযানের কথা......। প্রাইজ আর কটাই বা পেয়েছি বাবা?'

'তা বেশ ত', বললেন বাবা। 'নতুই বই এনে দেওয়া যাবেখন।'

'আপনি এখানে তীর্থঙ্কর বুক স্টলে বললে ওরা কলকাতা থেকে আনিয়ে দেবে বই', বললেন অঙ্ক স্যার, 'সেই সবই তুমি পড়বে এবার থেকে, তর্পণ। এগুলো বন্ধ।'

এগুলো বন্ধ। ওই দুটো কথায় যেন এক মুহূর্তে পৃথিবীটা টিপুর চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল। এগুলো বন্ধ!

আর বন্ধ যাতে হয় তার জন্য বাবাও অঙ্ক স্যারের থেকে নিয়ে বইগুলো তার আলমারির তাকে ভরে ফেলে চাবি বন্ধ করে দিলেন।

মা অবিশ্যি ব্যাপারটা শুনে বেশ খানিকক্ষণ গজর গজর করেছিলেন। খাবার সময় একবার ত বলে ফেললেন, 'যে লোক এমন কথা বলতে পারে তাকে মাস্টার করে রাখা কেন বাপু?'

বাবা পরপর তিনবার উহুঁ বলে মা-কে থামিয়ে দিলেন।—'তুমি বুঝছ না। উনি যা বলছেন টিপুর ভালোর জন্যই বলছেন।'

'ছাই বলছেন।' তারপর টিপুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তুই ভাবিস্‌নে রে। আমি বলব তোকে গল্প। তোর দিদিমার কাছ থেকে অনেক গল্প শুনেছি ছেলেবেলায়। সব ত আর ভুলিনি।'

টিপু কিছু বলল না। মুশকিল হচ্ছে কি, মা-র কাছে টিপু এককালে অনেক গল্পই শুনেছে। তার বাইরে মা আর কিছু জানেন বলে মনে হয় না। আর জানলেও, বই পড়ার মজা মুখে শোনা গল্পে নেই। বইয়ে ডুবে যাওয়া একটা আলাদা ব্যাপার। সেখানে শুধু গল্প আর তুমি—মাঝখানে কেউ নেই। সেটা মা-কে বোঝাবে কী করে?

আরো দুদিন গেল টিপুর বুঝতে যে এবার সত্যি সত্যিই সে দুঃখ পাচ্ছে। গোলাপীবাবু যে দুঃখের কথা বলেছিলেন, এটা সেই দুঃখ। এবার এক উনিই যদি কিছু করতে পারেন।

আজ রবিবার। বাবা ঘুমোচ্ছেন। মা বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকে সেলাই-এর কল চালাচ্ছেন। এখন বেজেছে সাড়ে তিনটে। এখন একবার পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া যেতে পারে। লোকটা যে কেন বলে গেল না সে কোথায় থাকে! সে না এলে টিপু সটান তার বাড়িতে চলে যেতে পারত।

টিপু পা টিপে টিপে একতলায় নেমে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

চারিদিকে রোদ ঝলমল করছে, কিন্তু তাও বেশ শীত শীত ভাব। দূরে ধান ক্ষেতে সোনালী রং ধরে আছে পাহাড়ের লাইন অবধি। একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে একটানা, আর চিড়িক্ চিড়িক্ শব্দটা নিশ্চয়ই ওই শিরীষ গাছের বাসিন্দা কোনো একটা কাঠবেড়ালী করছে।

'হ্যালো।'

আরে! কী আশ্চর্য! কখন যে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে গাছতলায় সেটা টিপু

দেখতেই পায়নি।

'তোমার কানের পিছনে নীল রঙ, হাতের তেলো খস্‌খসে, বুঝতেই পারছি তোমার দুঃখের কারণ ঘটেছে।'

'তা ঘটেছে বৈকি।'

লোকটা এগিয়ে আসছে টিপুর দিকে। আবার সেই পোশাক। আবার মাথার চুলগুলো ফংফং করে ঝুঁটির মতো উড়ছে বাতাসে।

'কী ঘটেছে সেটা বলতে হবে ত, নইলে আমি কিংকর্তব্যমতিত্ব।'

টিপুর হাসি পেলেও, লোকটাকে শুধরোবার চেষ্টা না করে অঙ্ক স্যারের পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে ফেলল। বলতে বলতে চোখে জল এসে গেলেও মনের জোরে নিজেকে সামলে নিল টিপু।

'হুঁ' বলে লোকটা ষোলবার ধীরে ধীরে মাথা উপর-নিচ করল। টিপু ভেবে-ছিল আর থামবেই না; আর সেই সঙ্গে এও মনে হয়েছিল যে লোকটা হয়ত কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। যদি না পায় তাহলে যে কী দশা হবে সেটা ভেবে টিপুর আবার চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটা মাথা নাড়া থামিয়ে আবার 'হুঁ' বলাতে টিপুর ধড়ে প্রাণ এল।

'তুমি কিছু করতে পারবে কি?' টিপু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ভেবে দেখতে হবে। পাকস্থলীটা খাটাতে হবে।'

'পাকস্থলী? কেন, তোমরা মাথা খাটাও না বুঝি?'

লোকটা কোন উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোমার এই নরহরি স্যারকে কাল দেখলাম না মাঠে ঘোড়া চড়তে?'

'কোন্ মাঠে? হামলাটুনির মাঠে?'

'যে মাঠে ভাঙা বাড়িটা আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি কি সেইখানেই থাক?'

'ওই ভাঙা বাড়িটার পিছনেই আমার খ্রিডিঙ্গিপিডিটা রয়েছে।'

টিপু কথাটা ঠিক করে শোনেনি নিশ্চয়ই। তবে শুনলেও সেটা যে তার জিভ দিয়ে কিছুতেই বেরোত না সেটা সে জানে।

লোকটা এখনো আছে, আর আবার মাথাটা উপর-নিচ করতে আরম্ভ করেছে।

এবার একত্রিশবার নাড়াবার পর মাথা থামিয়ে লোকটা বলল, 'আজ ফুল্ মুন। তুমি যদি ব্যাপারটা দেখতে চাও, তাহলে চাঁদ যখন মাঠের মাঝখানের খেজুর গাছটার ঠিক মাথায় আসবে তখন মাঠে এসে যেও। আড়ালে থেক; কেউ যেন দেখে না ফেলে। তারপর দেখা যাক কী করা যায়।'

টিপুর হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় ঢুকে তাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিল।

'তুমি অঙ্ক স্যারকে মেরে-টেরে ফেলবে না ত?'

এই প্রথম লোকটাকে হো হো করে হাসতে দেখল টিপু, আর সেই সঙ্গে দেখল লোকটার মুখের ভিতর একটার উপর আরেকটা জিভ। আর দেখল যে লোকটার দাঁত বলে কিচ্ছু নেই।

'মেরে ফেলব?'—লোকটা কোনোরকমে হাসি থামাল।—'উঁহু। আমরা কাউকে মারি-টারি না। একজনকে চিমটি কাটার কথা ভেবেছিলাম বলেই ত আমার নির্বাসন। প্রথম ছক কেটে বেরোল পৃথিবীর নাম, সেখানে হবে নির্বাসন; তারপর ছক কেটে বেরোল এই শহরের নাম; তারপর তোমার নাম। তোমার দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েই আমার মুক্তি!'

ঠিক আছে, তাহলে——'

লোকটা সেদিনের মতোই টিপুর কথা শেষ হবার আগেই কুল গাছের উপর দিয়ে হাই জাম্প করে হাওয়া।

টিপুর শরীরের ভিতর সেই যে ঝিমি কাঁপুনি শুরু হল সেটা রইল রাত অবধি। আশ্চর্য কপাল,--আজ মা বাবা দুজনেই রাত্রে নেমন্তন্ন খেতে যাবেন সুশীলবাবুদের বাড়ি। সুশীলবাবুর নাতির মুখে ভাত। টিপুরও নেমন্তন্ন ছিল, কিন্তু সামনে পরীক্ষা, তাই মা নিজেই বললেন, 'তোর আর গিয়ে কাজ নেই। বাড়িতে বসে পড়াশুনা কর।'

সাড়ে সাতটায় মা-বাবা বেরিয়ে গেলেন। টিপু পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে পুব দিকটা হলদে হতে শুরু করেছে দেখে বেরিয়ে পড়ল।

ইস্কুলের পিছনের শর্টকাটটা দিয়ে বিষ্ণুরামবাবুদের বাড়ি পৌঁছতে লাগল মিনিট দশেক। ঘোড়াটা নেই। টিপুর ধারণা ওটা বাড়ির পিছন দিকে আস্তাবলে থাকে। সামনের বৈঠকখানার জানালা দিয়ে আলো রাস্তায় এসে পড়েছে, ঘরের ভিতর চুরুটের ধোঁয়া।

'কিস্তি।'

অঙ্ক স্যারের গলা। দাবা খেলছেন বিষ্ণুরামবাবুর সঙ্গে। তাহলে কি আজ ঘোড়া চড়বেন না? সেটা জানার কোনো উপায় নেই। লোকটা কিন্তু বলেছে হামলাটুনির মাঠে যেতে। টিপু যা থাকে কপালে করে সেই দিকেই রওনা দিল।

ওই যে পূর্ণিমার চাঁদ। এখনো সোনালী, রুপোলী হবে আরো পরে। নেড়া খেজুর গাছটার মাথায় পৌঁছতে এখনো মিনিট দশেক দেরি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না যাকে বলে সেটা হতে আরো সময় লাগবে, তবে একটা ফিকে আলো চারদিক ছেয়ে আছে। তাতে গাছপালা ঝোপঝাড় সবই বোঝা যাচ্ছে। ওই যে দূরে ভাঙা কুঠিবাড়ি। ওর পিছনে কোথায় থাকে লোকটা?

টিপু একটা ঝোপের পিছনে গিয়ে অপেক্ষা করার জন্য তৈরি হল। তার প্যান্টের পকেটে খবরের কাগজে মোড়া এক টুকরো পাটালি গুড়। টিপু তার খানিকটা মুখে পুরে চিবোতে লাগল। শেয়াল ডাকছে দূরের বন থেকে। আকাশ দিয়ে যে কালো জিনিসটা উড়ে গেল সেটা নিশ্চয়ই পেঁচা। গরম কোটের উপর একটা খয়েরি চাদর জড়িয়ে নিয়েছে টিপু। তাতে গা ঢাকা দেওয়ারও সুবিধে হবে, শীতটাও বাগে আসবে।

আটটা বাজার যে শব্দটা এলো দূর থেকে সেটা নিশ্চয়ই বিষ্ণুরামবাবুদের ঘড়ির শব্দ।

আর তার পরেই টিপু শুনতে পেল—খট্‌মট্‌-খট্‌মট্‌-খট্‌মট্‌-খট্‌মট্‌......

ঘোড়া আসছে।

টিপু ঝোপের পাশ দিয়ে মাথাটা বার করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মোড়ের দিকে।

হ্যাঁ, ঘোড়া ত বটেই, আর তার পিঠে নরহরি স্যার।

কিন্তু ঠিক এই সময় ঘটে গেল একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। একটা মশা কিছুক্ষণ থেকেই টিপুর কানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল, টিপু হাত চালিয়ে চালিয়ে সেটাকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু হঠাৎ সেটা



সুড়ুৎ করে ঢুকল গিয়ে তার নাকের ভিতর।

দু' আঙুল দিয়ে নাক টিপে যে হাঁচি চাপা যায় সেটা টিপু আগে পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু এখন নাক টিপলে মশাটা আর বেরোবে না মনে করে সে হাঁচিটা আসতে দিল, আর তার শব্দটা খোলা মাঠের শীতের রাতের থমথমে ভাবটাকে একেবারে খান্‌খান্‌ করে দিল।

ঘোড়া থেমে গেছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল টিপুর উপর।

'তর্পণ!'

টিপুর হাত পা অবশ হয়ে গেছে। সে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ছি ছি ছি! এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটা ভেস্তে দেওয়াতে লোকটা না জানি কী মনে করছে!

ঘোড়াটা এগিয়ে আসছিল তারই দিকে, পিঠে অঙ্ক স্যার, কিন্তু এমন সময় স্যারকে প্রায় পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে ঘোড়াটা সামনের পা দুটো তুলে একটা আকাশচেরা চিঁহিহি ডাক ছেড়ে এক লাফে রাস্তা থেকে মাঠে গিয়ে পড়ল।

আর তার পরেই টিপুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, দেখে যে ঘোড়া আর মাটিতে নেই।

ঘোড়ার দুদিকে দুটো ডানা। সেই ডানায় ঢেউ তুলে ঘোড়া আকাশে উড়তে লেগেছে, অঙ্ক স্যার উপুড় হয়ে ঘোড়ার পিঠ জাপটে ধরে আছেন, তাঁর জ্বলন্ত টর্চ হাত থেকে পড়ে গেছে রাস্তায়। চাঁদ এখন খেজুর গাছের মাথায়, জ্যোৎস্না এখন ফুটফুটে, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে অঙ্ক স্যারকে পিঠে নিয়ে বিষ্ণুরাম দাসের ঘোড়া আকাশভরা তারার দিকে উড়তে উড়তে ক্রমেই ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে।

পেগ্যাসাস!

ধাঁ করে টিপুর মনে পড়ে গেল।

গ্রীসের উপকথা। রাক্ষসী মেডুসা—তার মাথায় চুলের বদলে হাজার বিষাক্ত সাপ, তাকে দেখলে মানুষ পাথর হয়ে যায়—তরোয়াল দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলল বীর পারসিয়ুস, আর মেডুসার রক্ত থেকে জন্ম নিল পক্ষিরাজ পেগ্যাসাস।

'তুমি বাড়ি যাও, তর্পণ।'

পাশে দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত লোকটা, চাঁদের আলো তার মাথার সোনালী ঝুঁটিতে।—'এভরিথিং ইজ অল রাইট।'

তিনদিন হাসপাতালে ছিলেন অঙ্ক স্যার। শরীরে কোনো জখম নেই, খালি মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন, জিগ্যেস করলে কিছু বলেন না।

চারদিনের দিন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অঙ্ক স্যার টিপুদের বাড়িতে এলেন। বাবার সঙ্গে কী কথা হল সেটা টিপু জানে না। অঙ্ক স্যার চলে যাবার পরেই বাবা টিপুকে ডাকলেন।

'ইয়ে, তোর বইগুলো নিয়ে যা আমার আলমারি থেকে। উনি বললেন ওসব গল্পে ওঁর আপত্তি নেই।'

সেই লোকটাকে আর দেখেনি টিপু। তার খোঁজে একদিন গিয়েছিল কুঠি-বাড়ির পিছনটায়। পথে যেতে দেখেছে বিষ্ণুরামবাবুর ঘোড়া যেমন ছিল তেমনিই আছে। কিন্তু কুঠিবাড়ির পিছনে কিছু নেই।

শুধু একটা গিরগিটি দেখতে পেয়েছিল টিপু, যেটার রং একদম গোলাপী।

অপদার্থ

অপদার্থ কথাটা অনেক লোক সম্বন্ধে অনেক সময়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন আমাদের চাকর নবকেষ্ট। 'নব, তুই একটা অপদার্থ'—এই কথাটা ছেলেবেলায় মার মুখে অনেকবার শুনেছি। নব কিন্তু কাজ ভালোই করত; দোষের মধ্যে সে ছিল বেজায় ঘুমকাতুরে। দিনের বেলা প্রায়ই একটু টেনে ঘুম দেওয়ার ফলে বিকেলে চায়ের জলটা চড়াতে চারটের জায়গায় হয়ে যেত সাড়ে চারটে। কাজেই মা যে তাকে অপবাদটা দিতেন সেটা ছিল রাগের কথা।

কিন্তু সেজোকাকার বেলায় অপদার্থ কথাটা যেরকম লাগসই ছিল সেরকম আর কারুর বেলায় হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সেজোকাকা মানে যাঁর ভালো নাম ক্ষেত্রমোহন সেন, ডাক নাম ক্ষেতু। বাবারা ছিলেন পাঁচ ভাই। বাবাই বড়, তারপর মেজো সেজো সোনা আর ছোট। পাঁচের মধ্যে সেজো বাদে আর সকলেই জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। বাবা ছিলেন নামকরা উকীল। মেজো সম্মানিত অধ্যাপক, সংস্কৃত আর ইতিহাসে ডবল এম, এ। সোনা ব্যবসা করে কলকাতায় তিনখানা বাড়ি তুলেছিলেন, আর ছোট কালোয়াতি গানে বড় বড় মুসলমান ওস্তাদের বাহবা আর ছত্রিশটা সোনা-রুপোর মেডেল পেয়েছিলেন ধনী সমঝদারদের কাছ থেকে।

আর সেজোকাকা?

তাঁকে নিয়েই এই গল্প, তাই তাঁর কথাটা এককথায় বলা যাবে না।

সেজোকাকার জন্মের মুহূর্তে নাকি ভূমিকম্প হয়েছিল। অনেকের মতে সেই কারণে নাকি তাঁর ঘিলুতে জট পাকিয়ে যায়, আর তাই তাঁর এই দশা। হাম আর চিকেন পক্স একবার না একবার প্রায় সব শিশুদেরই হয়। সেজোকাকার এই দুটো ত হয়েই ছিল, সেই সঙ্গে কোনো-না-কোনো সময় হয়েছিল হুপিং কাশি, ডিপথিরিয়া, ডেঙ্গু, একজিমা, আসল বসন্ত। শিশু বয়সে সাতবার কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি উঠে নীল হয়ে সেজোকাকা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সাত বছরে সেজোকাকার তোৎলামো দেখা দেয়; সাড়ে ন'য়ে পেয়ারা গাছ থেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তোৎলামো সেরে যায়। এই পতনের ফলে সেজোকাকার গোড়ালি ভেঙে যায়। ডাক্তার বিশ্বাস সেটাকে ঠিকমতো জোড়া দিতে না পারায় সেজোকাকাকে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটতে হত। এই খোঁড়ানোর জন্য তাঁর আর খেলাধুলা করা সম্ভব হয়নি। হাতের টিপের অভাবে ক্যারম, আর মাথা খেলে না বলে তাসপাশাও হয়নি।

সেজোকাকা ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু পর পর তিনবার এফ.এ পরীক্ষায় ফেল হবার পর ওঁর বাবা, মানে আমার ঠাকুরদাদা, নিজেই ওঁর পড়াশুনা বন্ধ ক'রে দেন। বলেন, 'ক্ষেতু, তুই যখন একেবারেই অপদার্থ, তখন তোর এড়ুকেশনের পেছনে খরচ করা মানে টাকা জলে দেওয়া। তবে গলগ্রহ হয়ে থাকতে

দেওয়াও ত চলে না! তুই আজ থেকে ভোম্বলের সঙ্গে বাজারে যাবি। শাক সব্জি মাছ মাংস চিনে নিবি। তারপর থেকে সংসারের বাজারটা তুই-ই করবি।' ভোম্বল-কাকা হলেন বাবার এক দূরসম্পর্কের ভাই; আমাদের বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করেছেন, মানুষ হয়েছেন।

সেজোকাকা বেশ কিছুদিন বাজারে গেলেন ভোম্বলকাকার সঙ্গে। তারপর একদিন—সেদিন বাড়িতে লোক খাবে—ঠাকুরদা সেজোকাকার পকেটে দুটো দশ-টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, 'দেখি তুই কেমন জিনিসপত্তর চিনেছিস। আজ বাজারের ভার তোর ওপর।'

সেজোকাকাকে দিয়ে বাজার আর হল না, কারণ কাকার পাঞ্জাবীর পকেটে ফুটো, নোট দুখানা বাজারে পৌঁছানর আগেই পথে কোথায় গলে পড়েছে। এর পর থেকে কে আর কাকাকে ট্রাস্ট করবে?

আমার প্রথম স্মৃতিতে সেজোকাকার বয়স তেত্রিশ আর আমার তিন। কালী-পুজোর দিন সন্ধ্যাবেলা। ঘটনাটা মনে আছে কেন সেটা আরেকটু বললেই বোঝা যাবে। সেজোকাকা বারান্দার মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছেন, আর আমি তাঁর পিঠে চড়ে ঘোড়া-ঘোড়া খেলছি। পাশের বাড়ি থেকে হঠাৎ একটা জ্বলন্ত উড়নতুবড়ি এসে বারান্দার তক্তপোষের উপর পড়তেই 'সর্বনাশ' বলে সেজোকাকা সটান উঠে দাঁড়ালেন। তার ফলে আমি পিঠ থেকে ছিট্‌কে পড়লাম শান বাঁধানো মেঝেতে, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। সেদিন অবিশ্যি সেজোকাকাকে ভয়ংকর সব কথা শুনতে হয়েছিল বাড়ির প্রায় সকলের কাছ থেকেই। আমার কিন্তু একটু দুঃখ হয়েছিল কাকার জন্য। কেউ তাঁকে গ্রাহ্য করে না, এমনকি মানুষের মধ্যেই ধরে না, তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার কাকার উপর একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। মাঝারি হাইট, মাঝারি রং, মুখে সব সময়ই একটা খুশি আর দুঃখ মেশানো ভাব—মনে হত সব মানুষেরই বুদ্ধি হবে, সব মানুষই করিৎকর্মা হবে, তার কী মানে? শহরভর্তি এত লোকের মধ্যে একটা লোক যদি সেজোকাকার মতো হয় তাতে দোষ কি?

আমি তাই ফাঁক পেলেই তাঁর একতলার কোণের ঘরটায় গিয়ে সেজোকাকার সঙ্গে বসে গল্প করতাম। কদিন গিয়েই এটা বুঝেছিলাম যে সেজোকাকাকে গল্প বলতে বলে কোনো লাভ নেই, কারণ তাঁর কোনো গল্পই শেষ পর্যন্ত মনে থাকে না।

'তারপর কী হল সেজোকাকা?'

'তারপর? হুঁ...তারপর...দাঁড়া, তারপর...তারপর...তারপর...'

গলার স্বর 'তারপর' 'তারপর' বলতে বলতে ক্রমে দম ফুরোনো হারমোনিয়ামের মতো ক্ষীণ হয়ে আসে। সেজোকাকা গল্প থেকে গুন্‌গুন্‌ বেসুরো গানে চলে যান, শেষটায় গানও ফুরিয়ে গিয়ে কাকার মাথাটা ঘুমে ঢুলতে থাকে। বুঝতে পারি গল্পের বাকি অংশ মনে করার মেহনৎ কাকার পোষাচ্ছে না। তাঁকে সেই অবস্থায় রেখেই আমি পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, সেজোকাকা আর ডাকেনও না।

আমার যখন বছর বারো বয়স তখন একদিন তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি একটা মোটা বই খুলে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। জিগ্যেস করাতে বললেন আয়ুর্বেদের বই।

বললাম, 'ও বই পড়ে কী হবে সেজোকাকা?'

কাকা একটু ভেবে গম্ভীর ভাবে বললেন, 'এটাও ত একটা ব্যারাম, তাই না?'

'কোনটা?'

'এই যে আমার ব্যায়রা কিচ্ছু হচ্ছে না, কিচ্ছু মনে থাকে না, কিচ্ছু মাথায় ঢোকে না—এটা নিশ্চয়ই একটা রোগ?'

কী আর বলব? বললাম, 'তা ত হতেই পারে, সেজোকাকা।'

'তাহলে এর চিকিৎসা হবে না কেন?'

বললাম, 'তুমি নিজেই চিকিৎসা করবে নাকি?'

আমি জানতাম যে সেজোকাকার এই অপদার্থতার জন্য তাঁকে ডাক্তার দেখানোর কথা কেউ কোনোদিন ভাবেনি। সত্যি বলতে কি, ওঁর ছেলেবেলার সেই একগাদা ব্যারামের পর ওঁর আর বিশেষ কোনো অসুখবিসুখ করেনি। স্বাস্থ্যটা ওঁর মোটা-মুটি ভালোই ছিল।

সেজোকাকা বলে চললেন, 'চক বাজারে ফুটপাথে বইটা পড়ে ছিল, দশ আনা দিয়ে কিনে এনেছি। বোধ হয় কাজে দেবে। মনে হচ্ছে আমার ব্যারামের জন্যেও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা আছে।'

দুদিন বাদে—তখন বর্ষাকাল—বিকেলে সেজোকাকার ঘরে গিয়ে দেখি উনি বেরোবার তোড়জোড় করছেন। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, মালকোঁচা মেরে পরা ধুতি, গলায় জড়ানো সুতির চাদর আর হাতে ছাতা। বললেন, 'ভটচায পাড়ায় ভাঙা শিব মন্দিরটার পেছনে একটা গাছ আছে খবর পেয়েছি। তার শেকড় আমার চাই। ওইটে পেলেই—ব্যস্ নিশ্চিন্তি।'

সেজোকাকা বেরিয়ে পড়লেন। আকাশ ঘোলাটে হয়ে আসছে, তেমন তেমন বৃষ্টি নামলে কাকার প্ল্যান ভেস্তে যাবে।

আমি ঘণ্টাখানেক নিচে ঘুর ঘুর করে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেলাম। দক্ষিণের জানালা দিয়ে সামনের রাস্তা দেখা যায়। বৃষ্টি নামল না। সন্ধে যখন হব হব, তখন দেখি সেজোকাকা ফিরছেন। দুড়দাড় করে নিচে নেমে সদর দরজার মুখে কাকার সঙ্গে দেখা।

'পেলে শেকড়?'

'না রে। ভুল হয়ে গেল। একটা টর্চ নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। জায়গাটা জংলা আর বেজায় অন্ধকার।'

'কিন্তু ওটা কী?'

কাকার কথার মধ্যেই চোখ পড়েছে আমার। খদ্দরের পাঞ্জাবীর বুকে লাল রঙের ছোপ।

'তাই ত, এটা ত খেয়াল করিনি এতক্ষণ!'

পাঞ্জাবী খুলতেই বেরোল একটা জোঁক। ভীম যেমন দুর্যোধনের বুকের রক্ত খেয়েছিল, তেমনি ইনি সেজোকাকার বুকের রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল, টোকা দিতেই টপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

কিন্তু একটা জোঁকে আর সেজোকাকার কী হবে? কাঁধ, কনুই, কোমর, পায়ের গুল, হাঁটু, গোড়ালি—সব জায়গা মিলিয়ে চোদ্দটা জোঁক বেরোল কাকার গা থেকে। পাঁচ-ছ আউন্স রক্ত যে তাঁর আজ খোয়া গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, তাঁর আয়ুর্বেদ চর্চাও এই একটি ঘটনাই দিল বন্ধ করে।

পড়াশুনায় আমি ছিলাম রীতিমত ভালো। আমাদের সময় এফ. এ, এন-



ট্র্যান্সের যুগ শেষ হয়ে ম্যাট্রিক চলছে। পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্ড হয়ে বিজ্ঞান পড়ব বলে চলে এলাম কলকাতায়। হোস্টেলে থেকেই এম. এস. সি পর্যন্ত পড়ে পদার্থ বিজ্ঞানে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে চলে যাই আমেরিকায়। শেষ পর্যন্ত গবেষক হিসাবে আমার বেশ খ্যাতি হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও গবেষণার কাজ আমি একসঙ্গে চালাতে থাকি।

বাইরে থাকার ফলে সেজোকাকার সঙ্গে যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। একবার—তখন আমি সবে অধ্যাপনা শুরু করেছি—মা-র চিঠিতে এক অদ্ভুত খবর পেলাম। সেজোকাকা নাকি ফিল্মে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন। এখানে বলি যে সেজোকাকার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের চেহারার একটা সাদৃশ্য ছিল। দেহের গঠন মোটেই এক নয়—সেজোকাকা ছিলেন পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি—তবে নাক চোখ মুখের সাদৃশ্য সকলের চোখেই ধরা পড়ত। পরমহংসদেব সম্বন্ধে একটা ফিল্ম তোলা হবে এবং তাতে বিবেকানন্দের ভূমিকা আছে খবর পেয়ে সেজোকাকা নাকি সরাসরি প্রযোজকের সঙ্গে দেখা করে অভিনয় করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। চেহারায় মিলের জন্য পার্টটা পেতে নাকি তাঁর কোনোই অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু হপ্তাখানেক বাদেই আরেকটা চিঠিতে জানলাম কাকা নাকি ছবি থেকে বাদ হয়ে গেছেন। হবেন নাই বা কেন? ঘর বন্ধ করে প্রাণপণে পার্ট মুখস্থ করা সত্ত্বেও, এক নম্বর দৃশ্যে রামকৃষ্ণের কথার উত্তরে বিবেকানন্দের মুখ থেকে যদি তিন নম্বর দৃশ্যের উত্তর বেরিয়ে পড়ে, তাহলে আর তাঁকে দিয়ে কীভাবে কাজ চলে? অর্থাৎ ফিল্ম অভিনেতা হিসেবেও তিনি যে অপদার্থ সেটা সেজোকাকা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

আমার যখন আটচল্লিশ বছর বয়স তখন শিকাগোতেই আমার ছোট ভাইয়ের একটা চিঠিতে জানি যে সেজোকাকা এক সাধুবাবার শিষ্য হয়ে কোয়েম্বেটর চলে গেছেন।

গত বছর ডিসেম্বরের গোড়ায় আমার ছোটকাকার মেয়ে কাকলির বিয়েতে আমাকে কলকাতায় আসতে হয়। সঙ্গে আমার স্ত্রী আর আমার দুই মেয়ে—তারা দুজনেই পুরোপুরি আমেরিকায় মানুষ। ইতিমধ্যে সেজোকাকার আর কোনো খবর পাইনি। তাই কলকাতায় এসে যখন শুনলাম উনি শহরেই আছেন এবং বহাল তবিয়তে আছেন, তখন স্বভাবতই তাঁকে একবার দেখার জন্য মনটা উৎসুক হয়ে উঠল। আমার বয়স তখন ষাট। তাই সোজা হিসেবে সেজোকাকার নব্বুই। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে ইতিমধ্যে প্রবাসেই কাকার দেহান্ত ঘটেছে।

শুনলাম ফার্ন রোডে তাঁর ভাগ্নে, অর্থাৎ আমার ছোট পিসিমার ছেলে ডাক্তার রণেশ গুপ্তর বাড়িতে এসে তিনি উঠেছেন মাস তিনেক হল। আরো শুনলাম যে ধর্মকর্ম ব্যাপারটা মোটেই তাঁর ধাতে সয়নি। দশ বছরেও ইডলি-দোসায় অভ্যাস হয়নি। রোজ আধপেটা খেয়ে ওজন নাকি প্রায় ত্রিশ কিলো কমে গেছে। আমি এসেছি শুনে তিনি তাঁর ডাক্তার ভাগ্নেকে বলেছেন, 'ঝণ্টুকে বলিস একবার যেন এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।'

এক রবিবার সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হলাম ফার্ন রোডে। লোড শেডিং চলছে. দোতলার একটি ঘরে টিমটিমে মোমবাতি জ্বালিয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে খাটের উপর বসে আছেন সেজোকাকা। একটা মটকার চাদরের উপর গলায় প্যাঁচ দিয়ে জড়ানো সবুজ মাফলার।

কাকাকে দেখলে চেনা যায় বটেই, এবং বলতেই হবে বয়সের পক্ষে রীতিমতো

মজবুত চেহারা। মাথার চুল সব পাকা ঠিকই, কিন্তু এখনো যে চুল আছে সেটাই বড় কথা। আমায় দেখে হাসিতে মুখ ফাঁক হওয়াতে অরিজিন্যাল দাঁতও চোখে পড়ল ডজন খানেক, আর যখন কথা বেরোল তখন দেখলাম গলার স্বর ক্ষীণ হলেও কথায় বেশ তেজ আছে। এ তেজ কাকার মধ্যে আগে দেখিনি কখনো। তিনি যে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁকে আর কারুর কাছে মাথা নোয়াতে হয় না, এই বোধই হয়ত তাঁর মেজাজে একটা ভারিক্কি ভাব এনে দিয়েছে।

'কি রে ঝণ্টু', বললেন সেজোকাকা, 'মার্কিন মুলুকে গিয়ে কী করা হচ্ছে শুনি?'

আমার কাজের কথাটা যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে বললাম।

'পদার্থ বিজ্ঞান? গবেষণা?' বললেন সেজোকাকা। 'লোকে মান্যি করে?'

আমার সাতাত্তর বছরের পিসিমা গলা সপ্তমে চড়িয়ে আমার বিনয়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলেন আমার খ্যাতির কথা।

'বটে?' বললেন সেজোকাকা। 'নোবেল প্রাইজ পেয়েছিস কি না সেটা বল আগে।'

হাল্‌কা হেসে মাথা নাড়লাম।

'তবে আর কিসের বড়াই? ছ্যা ছ্যা ছ্যা—একেবারে অপদার্থ!'

আমি এই গুঁতোর ঠেলা সামলাতে না সামলাতে সেজোকাকার বাক্যস্রোত আমাকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে দিল।

'তুই ত যাহক ভিন মুলুকে পালিয়ে বাঁচলি, আমি ভাবলুম কলকাতায় গিয়ে একটু সোয়াস্তি মিলবে। জীবনের শেষ কটা দিন তবু আপনজনের সান্নিধ্যে কাটবে—তা এসব কি হচ্ছে বল ত? শকুনির ঠোকরে ত হাড় পাঁজরা বার করে দিয়েছে শহরটার। দিনে দশ ঘণ্টা বিজ্‌লি নেই। শ্বাস টানলে ধোঁয়া-ধুলোয় প্রাণ অতিষ্ঠ। জিনিসপত্তরের যা দর, উদরের সাধ মিটিয়ে ভালোমন্দ যে একটু খাব তারও জো নেই।—দূর দূর দূর—অপদার্থ, অপদার্থ।'

সেদিন বুঝলাম যে সেজোকাকার উপর থেকে আমার পুরোন টানটা এখনো যায়নি. কারণ তাঁর কথাগুলো শুনে আমার মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। মনে হল আমরা বোধহয় অ্যাদ্দিন ভুল করে এসেছি, উল্টো ভেবে এসেছি; আসলে কাকা দিব্যি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, আমরা শুদ্ধ দুনিয়াটাই অপদার্থ।

কিন্তু কথাটা যে ঠিক নয় সেটা সেজোকাকাই প্রমাণ করে দিলেন কয়েক দিনের মধ্যে।

এক সকালে ছোট পিসিমার বাড়ি থেকে ফোন এল যে সেজোকাকা ভোর রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছেন। আর যাবার দিনটাও মোক্ষম বেছেছেন কাকা, কারণ সেদিনই সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে আমার ভাগ্নীর বিয়ে।

ফার্স্ট ক্লাস কামরা

আগের আমলের ফার্স্ট ক্লাস কামরা—বাথরুম সমেত ফোর বার্থ বা সিক্স বার্থ কম্পার্টমেণ্ট—আজকাল উঠেই গেছে। এটা যে সময়ের গল্প, অর্থাৎ নাইনটীন সেভেনটি—তখনও মাঝে মাঝে এক আধটা এই ধরনের কামরা কী করে জানি ট্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়ত। যাদের পুরোন ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা আছে, সেই সব ভাগ্যবান যাত্রী এমন একটি কামরা পেলে মনে করত হাতে চাঁদ পেয়েছে।

রঞ্জনবাবুও ঠিক তেমনই বোধ করলেন গাড়িতে উঠে। প্রথমে তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। এই ধরনের কামরায় শেষ কবে তিনি চড়েছেন তা আর মনে নেই। পয়সাওয়ালা বাপের ছেলে, তাই ফার্স্ট ক্লাসে চড়ার অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই। একক কামরা উঠে গিয়ে যখন ছয় কামরা বিশিষ্ট করিডর ট্রেন চালু হল, তখন রঞ্জনবাবু বুঝলেন আরেকটা আরামের জিনিস দেশ থেকে উঠে গেল। গত কয়েক বছর থেকেই এ জিনিসটা লক্ষ করে আসছেন তিনি। বাপের ছিল ব্যুইক্ গাড়ি। পিছনের সীটে চিত হয়ে পা ছড়িয়ে বসে কত বেড়িয়েছেন সে গাড়িতে। তারপর এল ফিয়াট-অ্যামবাসাডরের যুগ। আরামের শেষ। বৃটিশ আমলে টেলিফোন তুললে মহিলা অপারেটর বলতেন 'নাম্বার প্লীজ'; তারপর নম্বর চাইলেই লাইন পাওয়া যেত নিমেষের মধ্যে। আর এখন ডায়াল করতে করতে তর্জনীর ডগায় কড়া পড়ে যায়। সমস্ত কলকাতা শহর থেকেই যেন আরাম জিনিসটা ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ট্রামে বাসে তাঁকে চড়তে হয়নি কোনদিন, কিন্তু মোটর গাড়িতেই বা কী সুখ আছে? ট্র্যাফিক জ্যামের ঠেলায় প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, গাড্ডায় গাড়ি পড়লে শরীরের হাড়গোড় আলগা হয়ে আসে।

রঞ্জনবাবুর মতে এ সবই আসলে দেশ স্বাধীন হবার ফল। সাহেবদের আমলে এমন মোটেই ছিল না। কলকাতাকে তখন সত্যিই একটা সভ্য দেশের সভ্য শহর বলে মনে হত।

রঞ্জনবাবু বছর তিনেক আগে ছ'মাস কাটিয়ে এসেছেন লণ্ডন শহরে। সাহেবরা বাঁচতে জানে, সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের মূল্য জানে, সিভিক সেন্স কাকে বলে জানে। ঘড়ির কাঁটার মতো লণ্ডন টিউবের গতিবিধি দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। আর যেমন মাটির নিচে, তেমন মাটির উপরে। ওখানেও ত জনসংখ্যা নেহাত কম নয়, কিন্তু কই, বাসস্টপে ত ধাক্কাধাক্কি নেই, গলাবাজি নেই, কণ্ডাক্টরের হুঙ্কার আর বাসের গায়ে চাপড় মারা নেই। ওদের বাস ত একদিকে কাৎ হয়ে চলে না যে মনে হবে এই বুঝি উল্টে পড়ল।

বন্ধুমহলে রঞ্জনবাবুর উগ্র সাহেবপ্রীতি একটা প্রধান আলোচনার বিষয়। ঠাট্টারও বটে আর সেই কারণেই হয়ত রঞ্জনবাবুর বন্ধুসংখ্যা ক্রমে কমে এসেছে।

শহরে যেখানে সাহেব প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে, সেখানে অনবরত সাহেব আর সাহেবী আমলের গুণকীর্তন কটা লোক বরদাস্ত করতে পারে? পুলকেশ সরকার ছেলেবেলার বন্ধু তাই তিনি এখনো টিকে আছেন, কিন্তু তিনিও সুযোগ পেলে বিদ্রূপ করতে ছাড়েন না। বলেন, 'তোমার এ দেশে জন্মানো ভুল হয়েছে। তোমার জাতীয় সংগীত হল গড সেভ দ্য কুইন, জনগণমন নয়। এই স্বাধীন নেটিভ দেশে তুমি আর বেশিদিন টিকতে পারবে না।'

রঞ্জনবাবু উত্তর দিতে ছাড়েন না।—'যাদের যেটা গুণ, সেটা অ্যাডমায়ার না করাটা অত্যন্ত সংকীর্ণ মনের পরিচায়ক। বাঙালীরা কলকাতা নিয়ে বড়াই করে— আরে বাবা, কলকাতা শহরের যেটা আসল বিউটি, সেই ময়দানও ত সাহেবদেরই তৈরি। শহরের যা কিছু ভালো সে ত তারাই করে দিয়ে গেছে। শ্যামবাজার বাগবাজার ভবানীপুরকে ত তুমি সুন্দর বলতে পার না। তবে এটাও ঠিক যে ভালোগুলো আর ভালো থাকবে না বেশি দিন। আর তার জন্য দায়ী হবে এই নেটিভ বাঙালীরাই।'

মধ্যপ্রদেশের রায়পুর শহরে দুই বন্ধুতে গিয়েছিল ছুটি কাটাতে। রঞ্জন কুণ্ডু একটা সাহেবী নামওয়ালা সদাগরী অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পুলকেশ সরকার একটি বড় বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। এবার পুজো ঈদ মিলিয়ে দুজনেরই দশ দিনের ছুটি পড়ে গেল। রায়পুরে দুজনের কমন ফ্রেন্ড মোহিত বোসের সঙ্গে এক হপ্তা কাটিয়ে গাড়িতে করে বস্তারের অরণ্য অঞ্চল ঘুরে দেখে দুজনের একসঙ্গে কলকাতা ফেরার কথা ছিল। পুলকেশবাবু একবার বলেছিলেন ভিলাইতে তাঁর এক খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে দুদিন কাটিয়ে ফিরবেন, কিন্তু রঞ্জনবাবু রাজি হলেন না। বললেন, 'এসেছি একসঙ্গে, ফিরবও একসঙ্গে। একা ট্র্যাভেল করতে ভালো লাগে না ভাই।'

শেষ পর্যন্ত স্টেশনে গিয়েও পুলকেশবাবুকে থেকেই যেতে হল। ভিলাই রায়পুর থেকে মাত্র মাইল দশেক। পুলকেশবাবু আসতে পারবেন না জেনে খুড়তুতো ভাই সশরীরে এসে হাজির হলেন দাদাকে বগলদাবা করে নিয়ে যাবার জন্য। ভিলাইয়ের বাঙালীরা বিসর্জন নাটক মঞ্চস্থ করবে পুজোয়, পুলকেশবাবুর থিয়েটারের নেশা, ভাইয়ের অনুরোধ তিনি যদি গিয়ে নির্দেশনার ব্যাপারে একটু সাহায্য করেন। পুলকেশবাবু আর না করতে পারলেন না।

রঞ্জনবাবু হয়ত খুবই মুসড়ে পড়তেন, কিন্তু পুরোন ফার্স্ট ক্লাস কামরাটি দেখে তিনি এতই বিস্মিত ও পুলকিত হলেন যে বন্ধুর অভাবটা আর অত তীব্রভাবে অনুভব করলেন না। আশ্চর্য এই যে, সেকালের হলেও কামরার অবস্থা দিব্যি ছিমছাম। সব কটি আলোরই বাল্ব রয়েছে, পাখাগুলো চলে, সীটের চামড়া কোথাও ছেঁড়া নেই, বাথরুমটিও পরিপাটি।

আরো বড় কথা হচ্ছে ফোর বার্থ কামরায় রঞ্জন কুণ্ডু আর পুলকেশ সরকার ছাড়া আপাতত আর কেউ যাত্রী নেই। পুলকেশবাবু খোঁজ নিয়ে জানালেন, 'তুমি রাউরকেলা পর্যন্ত একা যেতে পারবে। সেখানে একটি যাত্রী উঠবেন, তারপর আর কেউ নেই। দুটো আপার বার্থ সারা পথই খালি যাবে।'

রঞ্জনবাবু বললেন, 'তোমাকে এই পুরোন কামরার আরামের কথা অনেকবার বলেছি, আপশোস এই যে এতে ট্র্যাভেল করার সুযোগ পেয়েও নিতে পারলে না।'

বন্ধু হেসে বললেন, 'হয়ত দেখবে কেল্‌নারের লোক এসে তোমার ডিনারের অর্ডার নিয়ে গেল।'

'ওটা বলে আবার মন খারাপ করে দিও না', বললেন রঞ্জনবাবু। 'ট্রেনে খাবার কথা ভাবতে গেলে এখন কান্না আসে। আমাদের ছেলেবেলায় কেল্‌নারের লাঞ্চ আর ডিনারের জন্য আমরা মুখিয়ে থাকতাম।'

রঞ্জনবাবু অবিশ্যি বন্ধুর বাড়ি থেকে লুচি তরকারি নিয়ে এসেছেন টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে। রেলের থালিতে তাঁর আদৌ রুচি নেই।

যথাসময়ে বোম্বে মেল ছেড়ে দিল। 'কলকাতায় দেখা হবে ভাই', বললেন পুলকেশ সরকার। 'তোমার জার্নি আরামদায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই।'

গাড়ি ছাড়ার পরে রঞ্জনবাবু মিনিট খানেক শুধু কামরার মধ্যে পায়চারি করলেন। এ সুখ বহুকাল পাননি তিনি। আজকালকার কামরায় ট্রেন ছাড়লে পরে সীটে বসে পড়া ছাড়া আর গতি নেই। বাইরে করিডর আছে বটে, কিন্তু তা এতই সংকীর্ণ সেখানে হাঁটা চলে না। এক স্টেশন এলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করা যায়, তাছাড়া সারা রাস্তা অনড় অবস্থা।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর কোন সীটটা দখল করবেন এই নিয়ে একটু চিন্তা করে শেষে রায়পুরের প্ল্যাটফর্মের দিকের সীটটায় বসে সুটকেস থেকে একটা বালিশ ও একটা ডিটেকটিভ বই বার করে শুয়ে পড়লেন রঞ্জনবাবু। এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। অন্ধকার হয়ে যাবে একটুক্ষণের মধ্যেই। তবে বই পড়া বন্ধ করার প্রয়োজন নেই, কারণ মাথার পিছনে রীডিং লাইট আছে, এবং সেটা জ্বলে।

নটায় রায়গড় পেরোনর পর থেকেই একটা ঘুমের আমেজ অনুভব করলেন রঞ্জনবাবু। বিলাসপুরে লোক এসেছিল ডিনারের অর্ডার নিতে। রঞ্জনবাবু স্বভাবতই তাকে না করে দিয়েছেন। এবারে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাওয়াটা সেরে নীল লাইট ছাড়া আর সব কটা আলো নিভিয়ে দিয়ে রঞ্জনবাবু বেঞ্চিতে গা এলিয়ে দিলেন। দেওয়া মাত্র মনে পড়ল রাউরকেলায় যাত্রী ঢুকবে ঘরে। আজকাল করিডর ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে কোনো যাত্রী উঠলে কন্ডাক্টর গার্ডই তার ব্যবস্থা করে দেয়। এই পুরোন গাড়িতে তাঁকেই উঠে দরজা খুলতে হবে। তাহলে কি দরজাটা লক্‌ করবেন না? যদি ঘুম না ভাঙে? ক্ষতি কি লক্‌ না করলে? যিনি আসবেন তিনিই না হয় লক্‌ লাগিয়ে নেবেন। আর এমন কিছু মাঝ রাত্তির নয় তো, রাউরকেলা আসে বোধহয় সাড়ে দশটা নাগাদ। চিন্তার কোন কারণ নেই।

বেদম বেগে ছুটে চলেছে বোম্বাই মেল। কামরার দোলানিতে কারুর কারুর ভালো ঘুম হয় না, কিন্তু রঞ্জনবাবুর হয়। কোথায় যেন পড়েছিলেন যে মা শিশুকে কোলে দোল দিয়ে ঘুম পাড়ানোর স্মৃতি শিশু বড় হলেও তার মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তাই ট্রেনের দোলানিতে ঘুম পাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ছেলেবেলায় ফার্স্ট ক্লাসে খাওয়া কেল্‌নারের চিকেন কারি অ্যান্ড রাইস আর কাস্টার্ড পুডিং-এর মধুর স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে রঞ্জনবাবু নিদ্রাসাগরে তলিয়ে গেলেন।

'গরম চায়! চায় গরম!'

ঘুমটা ভাঙল খোলা জানালার বাইরে থেকে ফেরিওয়ালার ডাক শুনে। স্টেশন। প্ল্যাটফর্মের ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলোর রশ্মি টেরচা ভাবে কামরায় ঢুকে তাঁর নিজের শরীর ও মেঝের খানিকটা অংশে পড়েছে।

'হিন্দু চায়! হিন্দু চায়!!'

কী আশ্চর্য অপরিবর্তনশীল এই স্টেশনের ফেরিওয়ালার ডাক। মনে হয়

একই লোক ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্টেশনে ঠিক একই ভাবে ডেকে চলেছে আবহমানকাল থেকে।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্টেশনের নাম দেখতে পেলেন না রঞ্জনবাবু। রাউরকেলা নয় ত?

নামটা মনে পড়তেই রঞ্জনবাবুর চোখ চলে গেল বেঞ্চির বিপরীত দিকে। একটা টুং টুং আওয়াজ কানে এসেছিল ঘুমটা ভাঙামাত্র। এবার আবছা নীল আলোয় দেখলেন একটি লোক বসে আছে বেঞ্চিতে। তার সামনে দুটো বোতল ও একটি গেলাস। গেলাসে পানীয় ঢাললেন ভদ্রলোক এইমাত্র। এবার সেই পানীয় চলে গেল তার মুখের দিকে।

মদ খাচ্ছেন নাকি সহযাত্রী? উনিই কি রাউরকেলায় উঠেছেন? এটা কি তাহলে চক্রধরপুর? বড় স্টেশন বলেই ত মনে হচ্ছে।

রঞ্জনবাবু আগন্তুকের দিকে চেয়ে দেখলেন। মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবে একটা বেশ তাগড়াই গোঁফ রয়েছে ভদ্রলোকের সেটা বোঝা যায়। পরনে শার্ট ও প্যান্ট, তবে নীল আলোতে তাদের রঙ বোঝা মুশকিল।

রঞ্জনবাবুকে নড়াচড়া করতে দেখেই বোধহয় আগন্তুক তাঁর সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন। মদের গন্ধ পাচ্ছেন রঞ্জনবাবু। তাঁর নিজের ওসব বদ অভ্যাস সেই, কিন্তু চেনাশোনার মধ্যে অনেকেই ড্রিংক করে। পার্টি-টার্টিতেও যেতে হয় তাঁকে। কাজেই কোন্ পানীয়ের কী গন্ধ সেটা মোটামুটি জানা আছে। ইনি খাচ্ছেন হুইস্কি।

'ইউ দেয়ার।'

সোজা রঞ্জনবাবুর দিকে মুখ করে ঘড়ঘড়ে গলায় হাঁক দিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।

গলা এবং উচ্চারণ শুনে রঞ্জনবাবুর বুঝতে বাকি রইল না যে যিনি উঠেছেন তিনি হচ্ছেন সাহেব। এ গলার দানাই আলাদা।

'ইউ দেয়ার!' আবার হাঁক দিয়ে উঠলেন অন্ধকারে বসা সাহেবটি। নেশা হয়ে গেছে এর মধ্যেই, নইলে আর এত মেজাজের কী কারণ থাকতে পারে?

'আপনি কিছু বলতে চাইছেন কি?' ইংরিজিতে প্রশ্ন করলেন রঞ্জনবাবু। মনে মনে বললেন পুরোন ফার্স্ট ক্লাসের সঙ্গে মানানসই বটে এই সাহেব সহযাত্রী!

'ইয়েস' বললেন সাহেব। 'গেট আউট অ্যান্ড লীভ মি অ্যালোন।'

অর্থাৎ ভাগো হিঁয়াসে। আমি একা থাকতে চাই।

এবার রঞ্জনবাবু বুঝলেন যে সাহেবের নেশাটা বেশ ভালোমতোই হয়েছে। কিন্তু কথাটার ত একটা উত্তর দিতে হয়। যথাসাধ্য শান্তভাবে বললেন, 'আমারও রিজার্ভেশন রয়েছে এই কামরায়। আমরা দুজনেই থাকব এখানে—তাতে ক্ষতিটা কী?'

গার্ডের হুইস্‌লের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের ভোঁ শোনা গেল, আর পর মুহূর্তেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বোম্বে মেল আবার রওনা দিল। রঞ্জনবাবু আড়চোখে স্টেশনের নামটা দেখে নিলেন। চক্রধরপুরই বটে।

এখন ঘরে নীল নাইট লাইট ছাড়া আর কোনো আলো নেই। রঞ্জনবাবু সাহেবটিকে একটু ভালো করে দেখার জন্য এবং মনে আরেকটু সোয়াস্তি আনার জন্য অন্য বাতি জ্বালানোর উদ্দেশ্যে সুইচের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু

সাহেবের 'ডোণ্ট'!' হুঙ্কার তাঁকে নিরস্ত করল। যাই হোক্, এতক্ষণে রঞ্জনবাবুর চোখ অন্ধকারে সয়ে গেছে। এখন সাহেবের মুখ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। গোঁফ জোড়াটাই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। চোখ দুটো কোটরে বসা। নীল আলোতে গায়ের রঙ ভারী ফ্যাকাসে মনে হচ্ছে। মাথার চুল সোনালী না সাদা সেটা বোঝার উপায় নেই।

'আমি নিগারের সঙ্গে এক কামরায় থাকতে রাজি নই। তোমায় বলছি তুমি নেমে পড়।'

নিগার! উনিশশো সত্তর সালে ভারতবর্ষে বসে কোনো ভারতীয়কে নিগার বলার সাহস কোনো সাহেবের হতে পারে এটা রঞ্জনবাবু ভাবতে পারেননি। বৃটিশ আমলে এ জিনিস ঘটেছে এ গল্প রঞ্জনবাবু শুনেছেন। সব সময়ে যে বিশ্বাস হয়েছে তা নয়। সাহেবদের সম্বন্ধে অনেক মিথ্যে অপবাদ রটিয়েছে বাঙালীরা। আর যদি বা সত্যি হয়ে থাকে, সে সব সাহেব নিশ্চয়ই খুব নিম্ন-স্তরের। ভদ্র সাহেব, সভ্য সাহেব যারা, তারা ভারতীয়দের সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার কখনই করতে পারে না।

রঞ্জনবাবুর বিস্ময়ের ভাবটা কেটে গেছে। তবে এখনও ধৈর্যচ্যুতি হয়নি। মাতালের ব্যাপারে ধৈর্যহারা হলে চলে না। সুস্থ অবস্থায় এ সাহেব কখনই এ ধরনের কথাবার্তা বলতে পারত না।

রঞ্জনবাবু সংযতভাবে বললেন, 'তুমি যে ভাবে কথা বলছ, সেরকম কিন্তু আজকাল আর কোনো সাহেব বলে না। ভারতবর্ষ আজ বছর পঁচিশেক হল স্বাধীন হয়েছে সেটা বোধ হয় তুমি জান।'

'হোয়াট ?'

কথাটা বলেই সাহেব রঞ্জনবাবুকে চমকে দিয়ে ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

'কী বললে তুমি ? ভারত স্বাধীন হয়েছে ? কবে ?'

'নাইনটীন ফর্টি সেভন। অগাস্ট দ্য ফিফটীন্থ।'

কথাটা বলতে গিয়ে রঞ্জনবাবুর হাসি পাচ্ছিল। স্বাধীনতার এতদিন পরে নিজের দেশে বসে কাউকে তারিখ সমেত খবরটা দিতে হচ্ছে এটা একটা কমিক ব্যাপার বৈকি!

'ইউ মাস্ট বি ম্যাড!'

'আমি ম্যাড নই সাহেব', বললেন রঞ্জনবাবু। 'আমার মনে হয় তোমার নেশাটা একটু বেশি হয়েছে।'

'বটে ?'

সাহেব হঠাৎ তাঁর ডান দিকে বেঞ্চির উপর থেকে একটা জিনিস তুলে নিলেন।

রঞ্জনবাবু সভয়ে দেখলেন সেটা একটা রিভলভার, আর সেটা সটান তাঁরই দিকে তাগ করা।

'সী দিস ?' বললেন সাহেব। 'আমি আর্মির লোক। আমার নাম মেজর ড্যাভেনপোর্ট। সেকেন্ড পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট। আমার মত অব্যর্থ নিশানা আর কারুর নেই আমার রেজিমেণ্টে। আমার হাত কাঁপছে কি ? তোমার শার্টের তৃতীয় বোতামের ডান দিকে আমার লক্ষ্য। ঘোড়া টিপলে সেইখান দিয়ে গুলি ঢুকে সোজা জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তোমার আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।



ভালো চাও ত বেরিয়ে পড়। একে ত নিগার। তার উপরে উন্মাদ, এটা কত সাল জান? নাইনটীন থার্টিটু। আমাদের অনেক উত্যক্ত করেছে তোমাদের ওই নেংটি পরা নেতা। স্বাধীনতার স্বপ্ন তোমরা দেখতে পার, কিন্তু সেটা বাস্তবে পরিণত হবে না কখনই।'

এবার সত্যিই প্রলাপ বকছেন সাহেব। উনিশশো সত্তর হয়ে গেল নাইনটীন থার্টিটু? নেংটি পরা নেতা গান্ধীজী মারা গেছেন তাও হয়ে গেছে তেইশ বছর।

'কাম অন নাউ, গেট আপ।'

সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। রঞ্জনবাবু লক্ষ করলেন তাঁর পা টলছে না। সবে শুরু করলেন কি তাহলে মদ থেকে? কিন্তু এত উল্টোপাল্টা বকছেন কেন? উনিই কি তাহলে উন্মাদ?

'আপ! আপ!'

রঞ্জনবাবুর গলা শুকিয়ে গেছে। তিনি সীট ছেড়ে মেঝেতে নামতে বাধ্য হলেন। সেই সঙ্গে প্রায় তাঁর অজান্তেই তাঁর হাত দুটো উপরের দিকে উঠে গেল।

'নাউ টার্ন রাউন্ড অ্যান্ড গো টু দ্য ডোর।'

সাহেব বলে কি? কমপক্ষে ষাট মাইল বেগে চলেছে মেল ট্রেন। তিনি কি চলন্ত অবস্থায় তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চান?

এই অবস্থাতেও কোনো মতে একটি কথা উচ্চারণ করতে সমর্থ হলেন রঞ্জনবাবু।

'শুনুন মেজর ড্যাভেনপোর্ট—এর পরেই টাটানগর। গাড়ি থামলে আমি যাব অন্য কামরায়—কথা দিচ্ছি। চলন্ত গাড়ি থেকে নামিয়ে আমাকে মেরে ফেলে আপনার কি লাভ?'

'টাটানগর? ও নামে কোনো স্টেশন নেই। তুমি আবার আবোল তাবোল বকছ।'

রঞ্জনবাবু বুঝলেন যে এটা উনিশশো বত্রিশ সাল সেটা যদি সাহেব বিশ্বাস করে বসে থাকেন তাহলে অবিশ্যি টাটানগর বলে কোনো স্টেশন থাকার কথা নয়। এখানে প্রতিবাদ করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে বললেন, 'ঠিক আছে, মেজর ড্যাভেনপোর্ট, আমারই ভুল। তবে এর পর অন্য যে কোনো স্টেশনে গাড়ি থামুক, আমি নেমে যাব। ঘণ্টাখানেকের বেশি তোমার নিগারের সঙ্গ বরদাস্ত করতে হবে না কথা দিচ্ছি।'

সাহেব যেন একটু নরম হয়ে বললেন, 'মনে থাকে যেন, কথার নড়চড় হলে তোমার লাশ পড়ে থাকবে লাইনের ধারে এটা বলে দিলাম।'

সাহেব গিয়ে তাঁর জায়গায় বসে হাত থেকে রিভলভার নামিয়ে রাখলেন বেঞ্চির এক পাশে। রঞ্জনবাবু এ যাত্রা প্রাণে মরেননি এটা ভেবে খানিকটা ভরসা পেয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। সাহেব যাই বলুন, এর পরের স্টেশন যে টাটানগর সেটা রঞ্জনবাবু জানেন। আসতে আরো এক ঘণ্টা দেরি। এই সময়টুকু তিনি এই কামরাতেই আছেন। তারপর কপালে কী আছে জানা নেই। অন্য ফার্স্ট ক্লাস কামরায় জায়গা পাবেন কি? সেটা জানা নেই। জানার উপায়ও নেই।

ড্যাভেনপোর্ট সাহেব আবার মদ্যপান শুরু করেছেন। সাময়িকভাবে তাঁর সামনের বেঞ্চের যাত্রীর কথাটা তিনি যেন ভুলেই গেছেন। রঞ্জনবাবু আধ বোজা চোখে চেয়ে রয়েছেন তাঁর দিকে। এমন এক বিভীষিকাময় ঘটনার মধ্যে তাঁকে পড়তে হবে কে জানত? পুলকেশ থাকলে এ জিনিস ঘটত কি? না, তা ঘটত না।

তবে এর চেয়েও সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারত। পুলকেশ রগচটা মানুষ। তাছাড়া শারীরিক শক্তি রাখে যথেষ্ট। তার দেশাত্মবোধ প্রবল। কোনো সাদা চামড়ার কাছ থেকে অপমান হজম করার লোক সে নয়। হয়ত ধাঁ করে একটা ঘুঁষিই লাগিয়ে দিত। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় এক গোরাকে ঘুঁষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেবার গল্প সে এখনো করে।

ট্রেন চলেছে রাতের অন্ধকার ভেদ করে। মিনিট দশেক পরে রঞ্জনবাবু অনুভব করলেন যে এই বিপদের মধ্যেও গাড়ির দোলানিতে তাঁর মাঝে মাঝে একটা তন্দ্রার ভাব আসছে।

এই অবস্থাতেই একটা নতুন চিন্তা তাঁকে হঠাৎ সম্পূর্ণ সজাগ করে দিল।

সাহেবের কোনো মালপত্র নেই। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় কি? একটা সামান্য হাত-বাক্সও কি থাকবে না? শুধু মদ, সোডার বোতল, গেলাস আর রিভলভার নিয়ে কি কেউ ট্রেনে ওঠে?

আর উনিশশো বত্রিশ সাল, নেংটি পরা নেতা, টাটানগর নেই—এসবেরই বা মানে কি?

মানে কি তাহলে একটাই যে সাহেব আসলে জ্যান্ত সাহেব নন, তিনি ভূত?

মেজর ড্যাভেনপোর্ট নামটা কি চেনা চেনা লাগছে?

হঠাৎ ধাঁ করে রঞ্জনবাবুর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

বছর পাঁচেক আগে ব্যারিস্টার বন্ধু নিখিল সেনের বাড়িতে আড্ডায় কথা হচ্ছিল। বিষয়টা সাহেব প্রীতি এবং সাহেব বিদ্বেষ। কে বলেছিল ঠিক মনে নেই, কিন্তু বোম্বে মেলেই একবার এক বাঙালীকে ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল এক গোরা সৈনিক। নামটা মেজর ড্যাভেনপোর্টই বটে। কাগজে বেরিয়েছিল খবরটা। সালটা জানা নেই, তবে থার্টিটু হওয়া আশ্চর্য না। সাহেবের হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল। সেই বাঙালী ছিলেন অসীম সাহস ও দৈহিক শক্তির অধিকারী। অপমান হজম করতে না পেরে সাহেবকে মারেন এক বিরাশি শিক্কা ওজনের ঘুঁষি। সাহেব উল্টে পড়েন এবং বেঞ্চির হাতলে মাথায় চোট লেগে তৎক্ষণাৎ মারা যান।

রঞ্জনবাবু অনুভব করলেন তাঁর হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও সামনের লোকটার দিকে আরেকবার না চেয়ে থাকতে পারলেন না তিনি।

মেজর ড্যাভেনপোর্ট হাতে গেলাস নিয়ে বসে আছেন। নাইট লাইটের আলো এমনিতেই উজ্জ্বল নয়; আলোর শেডও অপরিষ্কার, বাল্‌বের পাওয়ারও বেশি নয়। তার উপর গাড়ির ঝাঁকুনি। সব মিলিয়ে সাহেবের দেহটাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। হয়ত এই কামরাতেই সাহেবের মৃত্যু হয়েছিল—১৯৩২ সালে। আর তখন থেকেই এই পুরোন আমলের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় রোজ রাত্তিরে......

রঞ্জনবাবু আর ভাবতে পারলেন না। সাহেব আর তাঁর দিকে দৃকপাত করছেন না; তিনি মদ নিয়ে মশগুল হয়ে বসে আছেন।

চেয়ে থাকতে থাকতে রঞ্জনবাবু অনুভব করলেন যে তাঁর চোখের পাতা আবার ভারী হয়ে আসছে। ভূতের সামনে পড়ে মানুষের ঘুম পেতে পারে এটা তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন। মেজর ড্যাভেনপোর্ট একবার নেই, একবার আছেন। অর্থাৎ চোখের পাতা বন্ধ হলে নেই, আবার খুললেই আছেন। একবার যেন সাহেব তাঁর দিকে চাইলেন। তারপর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা একটা

কথা বার কয়েক এলো তাঁর কানে—'ডার্টি নিগার...ডার্টি নিগার...'

তারপর রঞ্জনবাবুর আর কিছু মনে নেই।

রঞ্জনবাবুর যখন ঘুম ভাঙল তখন জানালার বাইরে ভোরের আলো। সামনের বেঞ্চে কেউ নেই। রাত্রের বিভীষিকার কথা ভেবে তিনি একবার শিউরে উঠলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ফাঁড়া কেটে গেছে বুঝতে পেরে হাঁপ ছাড়লেন। এ গল্প কাউকে বলা যাবে না। প্রথমত, কেউ বিশ্বাস করবে না; দ্বিতীয়ত, তিনি যে সাহেব ভূতের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন এটা খুব জাহির করে বলার ঘটনা নয়। ডার্টি নিগার। কথাটা তাঁর আঁতে লেগেছিল বিশেষ ভাবে, কারণ তাঁর নিজের রং রীতিমতো ফরসা। অনেক রোদে পোড়া সাহেবের চেয়ে বেশি ফরসা। এই রঙের জন্য লণ্ডনে অনেকে তাঁকে ভারতীয় বলে বিশ্বাস করেনি। আর তাঁকেই কিনা বলে ডার্টি নিগার!

সংকল্প অনুযায়ী তাঁর ট্রেনের অভিজ্ঞতাটা রঞ্জনবাবু কাউকেই বলেননি। তবে তাঁর মধ্যে উগ্র সাহেবপ্রীতির ভাবটা যে অনেকটা কমেছে সেটা তাঁর কাছের লোকেরা অনেকেই লক্ষ করেছিল।

ঘটনার দশ বছর পরে একদিন সন্ধ্যায় তাঁর নিজের বাড়িতে বন্ধু পুলকেশের সঙ্গে বসে কফি খেতে খেতে রঞ্জনবাবু ব্যাপারটা উল্লেখ না করে পারলেন না।

'সেভেন্টিতে রায়পুর থেকে ফেরার সেই দিনটার কথা মনে পড়ে?'

'বিলক্ষণ।'

'তোমাকে বলি বলি করেও বলিনি, এক সাহেব ভূতের পাল্লায় পড়ে কী নাজেহাল হয়েছিলাম জান না।'

'মেজর ড্যাভেনপোর্টের ভূত কি?'

রঞ্জনবাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'সে কি? তুমি জানলে কী করে?'

পুলকেশবাবু তাঁর ডান হাতটা বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'মীট দ্য গোস্ট অফ মেজর ড্যাভেনপোর্ট।'

রঞ্জনবাবুর মাথা ঝিম ঝিম করছে।

'তুমি! তা তুমি অ্যাদ্দিন—?'

'বলে ফেললে ত সমস্ত ব্যাপারটাই ব্যর্থ হত ভাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার মধ্যে থেকে সাহেব প্রীতির ভূতটা তাড়ানো। ঘটনাটা যদি তুমি বিশ্বাস না কর, তাহলে কাজটা হবে কি করে? আমি নিগার বলছি, আর সাহেব নিগার বলছে--দুটোর মধ্যে তফাত নেই?'

'কিন্তু কী ভাবে—?'

'ভেরি ইজি.', বললেন পুলকেশ সরকার। 'তোমার কামরাটা দেখেই ফন্দিটা আমার মাথায় আসে। গাড়ি ছাড়ার পর তোমার পাশের ফার্স্ট ক্লাস বগিটাতে উঠে পড়ি। আমার ফার্স্ট এড বক্স থেকে তুলো নিয়ে গোঁফ করেছিলাম। তাছাড়া নো মেক-আপ। আমারই কামরায় একটি গুজরাটি বাচ্চার হাতে দেখলাম একটা খেলার রিভলভার। এক রাতের জন্য ধার চাইতে খুশি হয়ে দিয়ে দিল। তার বাপের সঙ্গে হুইস্কি ছিল। সেটাও চেয়ে নিলাম। অবিশ্যি কেন নিচ্ছি সেটাও বলতে হল। আমি নিজে খেয়েছি শুধু জল। হুইস্কির বোতলটা খোলা রেখেছিলাম যাতে তুমি গন্ধ পাও। বাস্। বাকি কাজ করেছিল তোমার কামরার নীল

আলো, আর তোমার কল্পনা।...আশা করি কিছু মনে করনি ভাই।'

রঞ্জনবাবু বন্ধুর হাতটা দুহাতে চেপে ধরলেন বটে, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না।

তাঁর বিস্ময়ভাবটা কাটতে লাগবে আরো দশ বছর।

গগন চৌধুরীর স্টুডিও

একটা ফ্ল্যাট দিনের বেলা দেখে পছন্দ হলেও, সেখানে গিয়ে থাকা না অবধি তার সুবিধে-অসুবিধেগুলো ঠিক বোঝা যায় না। সুধীন সরকার এইটেই উপলব্ধি করল ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাটে বসবাস আরম্ভ করে। এই একটা ব্যাপারেই ভাগ্যলক্ষ্মী একটু শুকনো হাসলেন ; না হলে তিনি যে সুধীনের প্রতি সবিশেষ প্রসন্ন তার নজিরের অভাব নেই।

যেমন তার পদোন্নতির ব্যাপারটাই ধরা যাক। সে এখন আপিসের একটি ডিপার্টমেন্টের হেড। ঠিক এত তাড়াতাড়ি মাথায় পৌঁছানোর কথা নয়; হাজার হোক তার বয়সটা ত বেশি নয়—এই আষাঢ়ে একত্রিশে পড়েছে সে। ডিপার্ট-মেন্টের কাঁধ অবধি এমনিতেই উঠেছিল সুধীন। মাথায় ছিল নগেন্দ্র কাপুর, যাঁর বয়স চল্লিশ, যিনি দীর্ঘাঙ্গ, সুপুরুষ, কর্মক্ষম; যিনি ছাই রঙের সাফারি সুট পরে আপিসে ঢুকলে সকলের দৃষ্টি চলে যায় তাঁর দিকে। সেই নগেন্দ্র কাপুর যে অকস্মাৎ টালিগঞ্জের গলফের মাঠে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাবেন সে কি কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল? এই মৃত্যুর পরেই সুধীন দেখল প্রায় প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সে কাপুরের জায়গা অধিকার করে বসেছে। এটা অবিশ্যি শুধু কপালজোরে নয়; সুধীন এই পদের উপযুক্ত নয় এ অপবাদ তাকে কেউ দেবে না।

তারপর এই ফ্ল্যাট। সুধীনের বাপ মা তাকে সংসারী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, সময়টাও ভালো, কাজেই সুধীনকে বাধ্য হয়েই সে অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছে! আগে পার্ক সার্কাসে যে ফ্ল্যাটটা ছিল, তার পায়রার খোপের মতো দুখানা ঘরে সংসার করা চলে না। তাছাড়া কাছেই ছিল একটা বিয়ে-সাদিতে ভাড়া দেওয়ার বাড়ি। অষ্টপ্রহর গ্রামোফোন রেকর্ডে সানাইয়ের বিকৃত বাঁশফাটা সুরে সুধীনের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। দালালের কাছ থেকে খবর পেয়ে সুধীন প্রথম যে ফ্ল্যাটটা দেখতে গেল সেটাই হল ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাট। দোতলার ফ্ল্যাট, তিনখানা বেশ বড় বড় ঘর, দুটো বাথরুম, দক্ষিণে বারান্দা, মেঝের মোজেইক, জানালার গ্রিল, ফ্ল্যাটের প্ল্যান—সব কিছুতেই সুপরিকল্পনা ও সুরুচির ছাপ। ভাড়া আটশো। সর্বোপরি বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে মোটামুটি সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে মনে হয়। সুধীনের আর দ্বিতীয় কোনো ফ্ল্যাট দেখতে হয়নি।

দু সপ্তাহ হল সে এসেছে এই ফ্ল্যাটে। প্রথম কদিন অত খেয়াল করেনি, তারপর একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখল তার চোখে বাইরে থেকে বিজলী আলো এসে পড়েছে। বেশ উজ্জ্বল আলো। এত রাত্রে আলো আসে কোত্থেকে?

সুধীন বিছানা ছেড়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সারা পাড়া অন্ধকার, কেবল একটি আলো জ্বলছে রাস্তার উল্টো দিকের প্রাচীন অট্টালিকার তিনতলার

একটি ঘরে। খোলা জানালার পর্দার উপর দিয়ে সটান এসে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকেছে সুধীনের ঘরে। শুধু ঘরে নয়, একেবারে সুধীনের বিছানায়। বালিশ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে শুলেও সে আলো পড়বে সুধীনের মুখে।

এ তো বড় জ্বালাতন! ঘর অন্ধকার না হলে মানুষ ঘুমোয় কি করে? অন্তত সুধীন সেটা পারে না। এটা কি রোজই হবে নাকি?

আরো এক সপ্তাহ দেখার পর সুধীন বুঝল এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। বারোটার কিছু আগে থেকেই আলোটা জ্বলে, এবং জ্বলে থাকে ভোর অবধি। অথচ নিজের ঘরের দক্ষিণের জানালা বন্ধ করে শোয়ায় সুধীনের ঘোর আপত্তি। কার না হয়? কলকাতায় ওই একটি জিনিসের অনেক দাম। দক্ষিণের জানালা। বিশেষ করে তার সামনে যদি অন্য কোনো বাড়ি না থাকে। সেটাও এ ফ্ল্যাটের একটা লোভনীয় দিক। জানালার সামনে রাস্তার ওপরে হল ওই পুরোন বনেদী বাড়িটার সংলগ্ন বাগান, যেখানে অদূর ভবিষ্যতে নতুন দালান ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। বাড়িটা কোনো এককালীন জমিদারের সেটা বোঝাই যায়। সংস্কার হয়নি বহুদিন, লোকজনও বিশেষ থাকে বলে মনে হয় না।

এক ওই তিনতলার ঘরে ছাড়া।

কোনো অজ্ঞাত কারণে ওই ঘরের বাসিন্দা সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখেন।

একতলার ফ্ল্যাটে ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন সোমেশ্বর নাগ। সুধীনের মাস চারেক আগে ইনি এসেছেন এই ফ্ল্যাটে। বছর পঞ্চান্ন বয়স, বেঙ্গল ক্লাবের মেমবার, সন্ধ্যাটা তিনি ক্লাবেই কাটান। এক শনিবার বিকেলে বাড়ির গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সুধীন তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিৎ বাক্যালাপের লোভ সামলাতে পারল না।

'আমাদের উল্টোদিকের বাড়িটা কাদের বলুন ত?'

'চৌধুরী। কেন, কী ব্যাপার?'

'না, মানে, বাড়িতে ত বিশেষ কেউ থাকে-টাকে বলে মনে হয় না, অথচ তিন-তলার একটা ঘরে সারারাত বাতি জ্বলে। সেটা লক্ষ করেছেন?'

'না, তা ত করিনি।'

'আপনাদের ঘরে আসে না আলো?'

'সেটা ত সম্ভব নয়। ওদের ছাতের পাঁচিলটা সামনে পড়ে ত। আমরা ত ঘরটাই দেখতে পাই না।'

'খুব বেঁচে গেছেন। আমার ত রাত্রে ঘুমই হয় না ওই আলোর জন্য।'

'ভেরি স্ট্রেঞ্জ। শুনেছি ত ওই এতবড় বাড়িতে একটি কি দুটি মাত্র প্রাণী থাকে। মালিক হলেন গগন চৌধুরী। তাঁকে বড় একটা দেখা-টেখা যায় না। আমি ত এসে অবধি দেখিনি। তবে আছেন বলে জানি। বয়স হয়েছে বোধহয়। শুনেছি এককালে ছবি-টবি আঁকতেন। আপনি এক কাজ করুন না। ভদ্রলোককে গিয়ে সোজাসুজি বলুন। অন্তত ওঁর নিজের ঘরের জানালাটা ত বন্ধ করে দিতে পারেন। এতটুকু কনসিডারেশন হবে না প্রতিবেশীর জন্য?'

এ কাজটা অবিশ্যি করা যায়, যদিও সহজ নয়। অনুরোধ করলেও সেটা যে গ্রাহ্য হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। রাত্রে কী ঘটনা ঘটে ওই গগন চৌধুরীর ঘরে?

সুধীন বুঝতে পারল, আলোর জন্য ব্যাঘাতের প্রশ্নটা বড় ঠিকই, কিন্তু ওই প্রাচীন অট্টালিকার ওই ঘরে কী ঘটছে সেটা জানার আগ্রহও কম নয়। তার বন্ধু মহিম রেসের মাঠে যাতায়াত করে; তার একটি বড়ো বাইনোকুলার আছে। সেটা

দিয়ে দেখলে কিছু জানা যাবে কি? বাইনোকুলারের দরকার এই জন্যেই যে ঘরটা নেহাত কাছে নয়। চৌধুরীদের বাড়িটা ঠিক রাস্তার উপরে নয়; পাঁচিল পেরিয়ে সামনে বেশ খানিকটা জায়গা আছে যেটা বাগানেরই অংশ। এই দূরত্বের পরেও আরও দূরত্ব আছে, কারণ তিনতলার ঘরটা ছাতের খানিকটা অংশ পেরিয়ে।

মহিমের বাইনোকুলারে জানালাটা চলে এল অনেকখানি কাছে, কিন্তু পর্দার উপর দিয়ে দেয়ালের খানিকটা অংশ ছাড়া বিশেষ কিছু দেখা গেল না। দেয়ালে টাঙানো তেল রঙে আঁকা দুটি আবক্ষ প্রতিকৃতির খানিকটা করে অংশ দেখা যাচ্ছে সীলিং-এর ওই আলোতে। তাহলে কি শিল্পীর ঘর? এটাই কি ছিল ভদ্রলোকের স্টুডিও? কিন্তু সেখানে কি কোনো মানুষ নেই?

হ্যাঁ, আছে। এইমাত্র জানালার পর্দায় ছায়া ফেলে একটা মূর্তি ডান থেকে বাঁ দিকে চলে গেল। কিন্তু ছায়া থেকে মানুষ চেনা গেল না। পর্দায় আলোটা পড়াতে তার স্বচ্ছতাও অনেকটা কমে গেছে।

প্রায় পনের মিনিট দেখার পর সুধীনের ক্লান্তি এল। যেটুকু ঘুমের সম্ভাবনা তাও কি সে নষ্ট করবে এই ছেলেমানুষী করে?

বাইনোকুলারটা টেবিলের উপর রেখে সুধীন শুয়ে পড়ল। সে মনে মনে স্থির করে নিয়েছে কী করা দরকার।

সোজা গিয়ে গগন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাঁকে বলবে তাঁর ঘরের উত্তরের দিকের জানালাটা বন্ধ রাখতে। এতে কাজ হলে হবে, না হলে সুধীনকে এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। গগন চৌধুরী লোকটা কিরকম সেটা জানা থাকলে ভালো হত—প্রতিবেশীর কাছ থেকে অভদ্র অপমানসূচক ব্যবহার হজম করা খুব কঠিন, তা তিনি যতই প্রবীণ হন না কেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া গতি নেই।

গেটটা খোলা, এবং দারোয়ান নেই দেখে সুধীনের একটু অবাক লাগল; কিন্তু প্রথম বাধা এত সহজে অতিক্রম করতে পারায় সেই সঙ্গে একটু নিশ্চিন্তও লাগল। সে রাত্রেই যাওয়া স্থির করেছে, কারণ ভদ্রলোক দেখতে চাইলে তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারবে আলোটা কী ভাবে তার ঘরে পড়ে।

ভবানীপুরের ভদ্রপাড়া শীতকালের রাত এগারটার মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। গতকাল পূর্ণিমা ছিল; চৌধুরীবাড়ির আগাছায় পরিপূর্ণ বাগানের সব কিছুই জ্যোৎস্নার আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শ্বেতপাথরের নারীমূর্তি ডাইনে ফেলে সুধীন এগিয়ে গেল নোনা ধরা গাড়ি বারান্দার দিকে। এখনো তিনতলার ঘরে আলো জ্বলেনি। কপাল ভালো হলে গগন চৌধুরীকে হয়ত নিচেই পাওয়া যেতে পারে।

সদর দরজার কড়া নাড়তে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটি ভৃত্যস্থানীয় প্রৌঢ় দরজা খুলে প্রশ্ন করল—'কাকে চাই?'

'চৌধুরী মশাই—গগন চৌধুরী—তিনি কি শুয়ে পড়েছেন?'

'না।'

'তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যায় কি? আমার নাম সুধীন সরকার। আমি থাকি ওই সামনের বাড়িতে। একটা বিশেষ কাজে এসেছি।'

চাকর ভিতরে গিয়ে আবার মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এল।

'আপনি আসুন।'

সব ব্যাপারটাই যে সহজে হয়ে যাচ্ছে—এ ত ভারী আশ্চর্য!

ভিতরে ঢুকে ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে একটা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকল সুধীন।

'বসুন।'

জানালা দিয়ে এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে সোফার উপর, তাই সুধীন সেটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে বসল। চাকর বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল না কেন? এখন ত পাড়ায় লোডশেডিং নেই।

এবারে ঘরের চারদিকে চোখ ঘোরাতে সুধীনের হৃৎস্পন্দন হঠাৎ দেখতে দেখতে দ্বিগুণ হয়ে গেল।

সে কি ঘর ভর্তি লোকের মধ্যে এসে পড়ল নাকি? তাকে ঘিরে কারা চেয়ে রয়েছে তার দিকে?

ঘরের প্রায়ান্ধকারে দৃষ্টি আরেকটু অভ্যস্ত হতে সুধীন বুঝতে পারল যারা চেয়ে রয়েছে তারা মানুষ নয়, মুখোশ। প্রত্যেকটি মুখোশের চোখের চাহনি যেন তারই দিকে ঘোরানো। এসব মুখোশ যে এ দেশের নয় সেটাও বুঝেছে সুধীন। দেখে মনে হয় অধিকাংশই আফ্রিকার, কিছু দক্ষিণ আমেরিকার হতে পারে। সুধীন এককালে ভালো ছবি আঁকত, বাপের আপত্তি না থাকলে হয়ত সেটাকেই সে পেশা করত। হাতের নানারকম কাজ সম্বন্ধে তার এখনো যথেষ্ট কৌতূহল আছে।

সুধীন মনে মনে নিজের সাহসের তারিফ না করে পারল না। অন্ধকার ঘরে মুখোশ পরিবৃত এই ভৌতিক পরিবেশে অনেকেরই দাঁতকপাটি লেগে যেত।

ঘরে যে কখন লোক প্রবেশ করেছে তা সুধীন টের পায়নি। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন শুনে চমকে পাশ ফিরে সোফায় বসা মানুষটাকে দেখতে পেল।

'এত রাত্রে?'

সুধীন হাত দুটোকে প্রায় যন্ত্রের মতো সামনে তুলে নমস্কার করে কথা বলতে গিয়েও পারল না।

ইনি যে অভিজাত পরিবারের সন্তান তাতে কোনো সন্দেহ নেই—পরনে দোরোখা শালই তার পরিচয় দিচ্ছে—কিন্তু গায়ের রঙে এমন পাংশুটে রক্তহীন ভাব, আর চোখের চাহনিতে এমন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা সুধীন কখনো দেখেনি। এমন ব্যক্তিকে প্রথম দর্শনে কারুরই মুখ দিয়ে চট করে কথা বেরোবে না।

ভদ্রলোক নিষ্পলক দৃষ্টিতে সুধীনের দিকে চেয়ে আছেন। প্রায় এক মিনিট লাগল সুধীনের নিজেকে সামলে নিতে। তারপর সে মুখ খুলল।

'আমি একটা, মানে, অভিযোগ জানাতে এসেছি—কিছু মনে করবেন না। আপনিই গগন চৌধুরী ত?'

ভদ্রলোক একবার শুধু মাথাটা নাড়িয়ে জানিয়ে দিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি। প্রশস্ত ললাটের তিনদিক ঘিরে সিংহের কেশরের মতো আধপাকা চুল থেকে মনে হয় বয়স পঁয়ষট্টির কম না।

সুধীন বলে চলল, 'আমার নাম সুধীন্দ্রনাথ সরকার। আমি সামনের বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে থাকি। আসলে হয়েছে কি, আপনার তিনতলার ঘরের বাতিটা সারা রাত জ্বলে বলে বড্ড অসুবিধা হয়। আলোটা সোজা আমার মুখের উপর এসে পড়ে। যদি আপনার জানালাটা বন্ধ করে রাখতে পারতেন!—নইলে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়। সারাদিন আপিস করে রাত্তিরে ঘুমোতে না পারলে...'

ভদ্রলোক এখনো একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সুধীনের দিকে। এই ঘরের কি কোন

আলোই জ্বলে না নাকি?

অগত্যা সুধীনই আবার মুখ খুলল। ব্যাপারটাকে আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার।

'আমি যদি জানালা বন্ধ করি তাহলেও আলো আসবে না ঠিকই, কিন্তু দক্ষিণের জানালা ত, তাই...'

'আপনার জানালা বন্ধ করতে হবে না।'

'আজ্ঞে?'

'আমিই করব।'

হঠাৎ যেন একটা বিরাট ভার নেমে গেল সুধীনের বুক থেকে।

'ওঃ, তাহলে ত কথাই নেই। অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনি উঠছেন?'

সুধীন ওঠার উদ্যোগ করছিল ঠিকই, কিন্তু এই প্রশ্নে একটু অবাক হয়েই আবার বসে পড়ল—'রাত হল ত। আর আপনিও নিশ্চয়ই শুতে যাবেন।'

'আমি রাত্রে ঘুমোই না।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি সুধীনের দিক থেকে এক চুল নড়েনি।

'লেখাপড়া করেন বুঝি?' সুধীন ধরা গলায় প্রশ্ন করল। এই পরিবেশে গগন চৌধুরীর সান্নিধ্য যে খুব স্বস্তিকর নয় সেটা স্বীকার করতেই হবে।

'না।'

'তবে?'

'ছবি আঁকি।'

সুধীনের মনে পড়ে গেল বাইনোকুলার দিয়ে ঘরের দেয়ালে পেণ্টিং দেখে মনে হয়েছিল সেটা চিত্রকরের স্টুডিও হতে পারে। নাগ মশাইও বলেছিলেন ইনি এককালে ছবি আঁকতেন।

'তার মানে ওই ঘরটা আপনার স্টুডিও?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'কিন্তু সে কথা বোধহয় পাড়ার বিশেষ কেউ জানে না?'

গগন চৌধুরী একটা শুকনো হাসি হাসলেন।

'আপনার সময় আছে?'

'সময়, মানে...'

'তাহলে কতগুলো কথা বলি। অনেক দিনের জমে থাকা কথা। কাউকে বলার সুযোগ হয়নি কখনো।'

সুধীন অনুভব করল ভদ্রলোকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।

'বলুন।'

'পাড়ার লোকে জানে না কারণ জানার আগ্রহ নেই। একটা লোক সারাটা জীবন শিল্পচর্চা করে গেল, কিন্তু সে সম্বন্ধে কারুরও কোন কৌতূহল নেই। এককালে যখন এগজিবিশন করেছি, তখন কেউ কেউ এসে দেখেছে, অল্প বিস্তর সুখ্যাতিও করেছে। কিন্তু যখন হাওয়া বদলাতে শুরু করল, মানুষের যে ছবি রক্তমাংসের মানুষ বলে চেনা যায় তার কদর আর যখন রইল না, তখন থেকে আমি গুটিয়ে নিয়েছি নিজেকে। নতুনের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলতে আমি শিখিনি। মনে মনে দা ভিঞ্চিকে গুরু বলে মেনেছিলাম; এখনও তিনিই আমার গুরু।'

'কিন্তু...আপনি কিসের ছবি আঁকেন?'

'মানুষের।'

'মানুষের?'

'পোর্ট্রেট।'

'মন থেকে?'

'না। সেটা আমি পারি না, শিখিনি। আমার সামনে কেউ এসে না বসলে আমি ছবি আঁকতে পারি না।'

'এই মাঝরাত্তিরে—?'

'আসে। মডেল আসে। সিটিং দেয়। রোজই আসে।'

সুধীন কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে বসে রইল। এ কেমনতরো কথাবার্তা বলছেন ভদ্রলোক? এ যে পাগলের প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে!

'বিশ্বাস হচ্ছে না!' গগন চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে এই প্রথম একটা পরিষ্কার হাসির আভাস দেখা গেল। সুধীন কী বলবে বুঝতে পারল না।

'আসুন আমার সংগে।'

সুধীন এ আদেশও অমান্য করতে পারল না। ভদ্রলোকের চোখে এবং কথায় একটা সম্মোহনী শক্তি আছে সেটা মানতেই হবে। তার নিজেরও যে কৌতূহল হচ্ছে না তা নয়। কেমন ছবি আঁকেন ভদ্রলোক? কারা আসে সিটিং দিতে মাঝ-রাত্তিরে? কী ভাবে তাদের জোগাড় করা হয়?

'এক আমার স্টুডিওতে ছাড়া বাড়ির আর কোথাও ইলেকট্রিসিটি নেই,' কেরোসিন ল্যাম্পের আবছা হলদে আলোয় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললেন ভদ্রলোক।—'বাকি সব কানেকশন কেটে দিয়েছি।'

আশ্চর্য এই যে, ল্যান্ডিং-এ, সিঁড়ির দেয়ালে, বৈঠকখানায়—কোথাও একটিও পেন্টিং নেই। সবই কি তাহলে স্টুডিওতে জড়ো করে রেখেছেন ভদ্রলোক?

তিনতলায় উঠে বাঁয়ে ঘুরেই সামনে একটা দরজা। সেই ঘরে সুধীনকে নিয়ে ঢুকে দরজা আবার বন্ধ করে দিয়ে বাঁয়ে দেয়ালে একটা সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোতে ঘরটা ভরে গেল।

এটাই যে স্টুডিও সেটা আর বলে দিতে হয় না। আঁকার সব সরঞ্জামই রয়েছে এখানে। ঘরের এক পাশে আলোর ঠিক নিচে ইজেলে একটা সাদা ক্যানভাস খাটানো রয়েছে। তাতে নতুন ছবি শুরু হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

সরঞ্জামের বাইরে যেটা আছে সেটা হল দেয়ালে টাঙানো এবং মেঝেতে ডাঁই করে রাখা পোর্ট্রেট। কমপক্ষে একশো ত হবেই। মেঝেরগুলো এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে না ধরলে বোঝা যাবে না। যেগুলো চোখের সামনে জলজ্যান্ত সে হল দেয়ালে টাঙানো পোর্ট্রেটগুলো। অধিকাংশই পুরুষের ছবি। সুধীন তার তৈরি চোখে বুঝে নিল সাবেকী ঢং-এ আঁকা পেন্টিংগুলোতে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় আছে। এখানেও সুধীনের মনে হল যে সে যেন অনেক জ্যান্ত মানুষের ভিড়ে এসে পড়েছে—এবং সবাই চেয়ে আছে তারই দিকে—কমপক্ষে পঞ্চাশ জোড়া চোখ।

কিন্তু এরা সব কারা? দু একটা মুখ চেনা চেনা মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু—

'কেমন লাগছে?' প্রশ্ন করলেন গগন চৌধুরী।

'উঁচু দরের কাজ,' স্বীকার করতে বাধ্য হল সুধীন।

'অথচ অয়েল পেন্টিং-এ পোর্ট্রেট আঁকার রেওয়াজটাই লোপ পেয়ে গেছে। সেখানে আমাদের মতো শিল্পীদের কী দশা হয় ভেবে দেখেছেন?'

'কিন্তু এ ঘরে এসে ত মনে হচ্ছে না যে আপনার কাজের অভাব আছে।'

'কী বলছেন! সে ত এখন! এককালে পনের বছর ধরে সমানে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছি—একটি লোকও সাড়া দেয়নি। শেষটায় বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিই।'

'তারপর? আবার আঁকা শুরু হল কি করে?'

'অবস্থার পরিবর্তনের ফলে।'

সুধীন আর কিছু বলল না, কারণ তার সমস্ত মন এখন ছবির দিকে। ইতিমধ্যে সে তিনজনকে চিনতে পেরেছে। একজন মাস চারেক হল মারা গেছেন। বিখ্যাত গায়ক অনন্তলাল নিয়োগী। সুধীন আসরে বসে তাঁর গান শুনেছে বছর আষ্টেক আগে।

দ্বিতীয়জন হলেন অসীমানন্দ স্বামী—এককালে স্বদেশী করে পরে সন্ন্যাসী হয়ে যান। ইনিও মারা গেছেন বছর খানেক হল। কাগজে ছবি বেরিয়েছিল, সুধীনের মনে আছে।

তৃতীয় ব্যক্তি হলেন এয়ার ইন্ডিয়ার বাঙালী পাইলট ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী। লন্ডন যাবার পথে বোইং দুর্ঘটনায় আড়াইশো যাত্রী সমেত এঁরও মৃত্যু হয় বছর তিনেক আগে। সুধীন যে শুধু ছবি থেকেই চিনল এঁকে তা নয়; একবার আপিসের কাজে রোম যাবার পথে প্লেনের ককপিটে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

সুধীন একটা প্রশ্ন না করে পারল না।

'এরা কি শুধুই পোর্ট্রেট করানোর উদ্দেশ্যে এসেছিলেন? সে ছবি নিজেরা নেননি কখনো?'

গগন চৌধুরীকে এই প্রথম গলা ছেড়ে হাসতে শুনল সুধীন।

'না, মিস্টার সরকার, পোর্ট্রেটে এঁদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য আঁকা।'

'আপনি কি বলতে চান রোজই কেউ না কেউ এসে আপনাকে সিটিং দেন?'

'সেটা আর একটুক্ষণ থাকলেই দেখতে পাবেন। আজও লোক আসবে।'

সুধীনের মাথা ক্রমেই গুলিয়ে যাচ্ছে।

'কিন্তু এঁদের সঙ্গে যোগাযোগটা কী ভাবে—?'

'দাঁড়ান, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার সিসটেমটা একটু আলাদা।'

তাক থেকে একটা বেশ বড় খাতা নামিয়ে সুধীনের দিকে নিয়ে এলেন গগন চৌধুরী।

'এটা খুলে দেখুন এতে কী আছে।'

আলোর তলায় নিয়ে গিয়ে খাতাটা খুলল সুধীন।

খাতার পাতার পর পাতায় আঠা দিয়ে সাঁটা রয়েছে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে কাটা মৃত্যুসংবাদ। অনেকগুলো খবরের সঙ্গে ছবিও রয়েছে। সুধীন দেখল যে কিছু কিছু কাটিং-এর পাশে পেনসিল দিয়ে চিকে দেওয়া রয়েছে।

'পেনসিলের দাগ হলে বুঝতে হবে তাদের ছবি আঁকা হয়ে গেছে,' বললেন গগন চৌধুরী।

'কিন্তু যোগাযোগটা করেন কি করে সেটা ত—'

গগন চৌধুরী সুধীনের হাত থেকে খাতাটা নিয়ে আবার সেটা তাকে রেখে দিলেন। তারপর ঘরে এগিয়ে এসে বললেন, 'ওটা সকলে পারে না, আমি পারি। এটা চিঠি বা টেলিফোনের কম্ম নয়। এঁরা যেখানে আছেন সেখানে ত আর



টেলিফোন নেই বা ডাক বিলির ব্যবস্থাও নেই। এ'দের জন্য অন্য উপায়ের প্রয়োজন হয়।'

সুধীনের হাত পা ঠাণ্ডা, গলা শুকিয়ে কাঠ। তাও একটা প্রশ্ন না করলেই নয়।

'আপনি কি বলতে চান এই সব লোকের পোর্ট্রেট করা হয়েছে এ'দের মৃত্যুর পর?'

'মৃত্যুর আগে এ'দের খবর পাবো কি করে সুধীনবাবু? আমি আর কলকাতার কটা লোককে চিনি? মৃত্যু না হলে ত তাঁরা আর তাঁদের গণ্ডীর বাইরে বেরোতে পারেন না! একমাত্র মৃত ব্যক্তিই ত সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন! তাঁদের সময়েরও অভাব নেই, ধৈর্যেরও অভাব নেই। ছবি যতক্ষণ না নিখুঁত হচ্ছে ততক্ষণ ঠায়ে বসে

থাকবেন ওই চেয়ারে।'

ঢং-ঢং-ঢং—

রাত্রের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা ঘড়ি বেজে উঠল। সিঁড়ির পাশে যে ঘড়িটা দেখেছিল সুধীন সেটাই বোধহয়।

'বারোটা,' বললেন গগন চৌধুরী। 'এইবার আসবেন।'

'কে?'—সুধীনের গলার স্বর অস্বাভাবিক রকম চাপা ও রুক্ষ। তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে।

'আজকে যিনি বসবেন তিনি। ওই তাঁর পায়ের শব্দ।'

সুধীন শ্রবণশক্তিটা এখনও হারায়নি, তাই সে স্পষ্ট শুনতে পেল বাইরে নিচ থেকে জুতোর শব্দ।

'এসে দেখুন।'—গগন চৌধুরী এগিয়ে গেছেন পাশের একটা জানালার দিকে। 'আমার কথা বিশ্বাস না হয় এসে দেখুন।'

এও কি সেই সম্মোহনী শক্তি? যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গিয়ে সুধীন গগন চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে দৃষ্টি দিল। তারপর তার অজান্তেই একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে—

'একে যে চিনি!'

সেই দৃপ্ত মিলিটারি ভঙ্গি, সেই দীর্ঘ গড়ন, সেই ছেয়ে রঙের সাফারি সুট।

ইনিই ছিলেন সুধীনের বস্—নগেন্দ্র কাপুর।

সুধীনের মাথা ঘুরছে। টাল সামলানোর জন্য সে ইজেলটাকে জাপটে ধরে ফেলল।

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের আওয়াজ উপরে উঠে আসছে। কাঠের সিঁড়িতে জুতোর ক্রমবর্ধমান শব্দে সমস্ত বাড়ি গমগম করছে।

এবার আওয়াজ থামল।

নৈঃশব্দ্যের মধ্যে গগন চৌধুরী মুখ খুললেন আবার।

'যোগস্থাপনের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না, সুধীনবাবু? ভেরি সিম্পল—এই ভাবে হাতছানি দিলেই চলে আসে!'

সুধীন বিস্ফারিত চোখে দেখল দোরোখা শালের ভিতর থেকে গগন চৌধুরীব ডান হাতটা বেরিয়ে সামনে প্রসারিত। সে হাতে মাংস, চামড়া কিছুই নেই—খালি হাড়!

'যে হাতে ডাকা, সে হাতেই আঁকা!'

সংজ্ঞা হারাবার আগের মুহূর্তে সুধীন শুনল স্টুডিওর বন্ধ দরজার বাইরে থেকে টোকা পড়ছে—

খট্ খট্ খট্—খট্ খট্ খট্—

খট্ খট্ খট্—খট্ খট্ খট্—

'দাদাবাবু! দাদাবাবু!'

এক ঝটকায় ঘুমটা ভেঙে গিয়ে দিনের আলোয় সুধীনকে আবার তখনই চোখটা কুঁচকে বন্ধ করে নিতে হল। বাপ্রে—কী ভয়ংকর স্বপ্ন!

'দরজা খুলুন! দাদাবাবু!'

চাকর অধীরের গলা।

'দাঁড়া, এক মিনিট।'

সুধীন বিছানা ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিল। অধীরের মুখে গভীর উদ্বেগ।

'আপনি এত বেলা অবধি—'

'জানি। ঘুমটা একটু বেশি হয়ে গেছে।'

'এত হৈ হল্লা বাড়ির সামনে, কিছুই টের পেলেন না?'

'হৈ হল্লা?'

'চৌধুরীবাড়ির বড়োবাবু যে মারা গেলেন কাল রাত্তিরে। গগনবাবু। চৌরাশি বছর বয়স হয়েছেল। ভুগছিলেন ত অনেকদিন। ঘরে বাতি জ্বালা থাকত রাত্তিরে দেখেননি?'

'তুই জানতিস ওঁর অসুখ?'

'জানব না? ওনার চাকর ভগীরথ—তার সঙ্গে ত দেখা হয় রোজ বাজারে।'

'বোঝো!'

বহুরূপী

নিউ মহামায়া কেবিনের একটি চেয়ার দখল করে হাফ কাপ চা আর আলুর চপ অর্ডার দিয়ে নিকুঞ্জ সাহা একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। তার চেনা-পরিচিতের কেউ এসেছে কি? হ্যাঁ, এসেছে বৈকি। ওই ত রসিকবাবু, আর ওই যে শ্রীধর। পঞ্চানন এখনো আসেনি, তবে মিনিট দশেকের মধ্যে এসে যাবে নিশ্চয়ই। যত বেশি চেনা লোক আসে ততই ভালো। চেনা লোক চিনতে না পারলে তবেই না ছদ্মবেশের সার্থকতা।

অবিশ্যি এখনো পর্যন্ত তার সব কটা ছদ্মবেশই আশ্চর্যরকম সফল হয়েছে। আজকে ত তাও দাড়ির আবরণ রয়েছে—মুখের অর্ধেকটা অংশই ঢাকা। বয়সও বাড়িয়ে নিয়েছে নিকুঞ্জ অন্তত বছর পঁচিশ। গতকালের মেক-আপ ছিল একটি ছোট্ট প্রজাপতি মার্কা গোঁফ, আর সেই সঙ্গে প্লাস্টিসিনের সাহায্যে নাকের শেপটা বদলানো। কিন্তু হাবভাব হাঁটাচলা গলার স্বর এমনই চতুর ভাবে পালটে নিয়েছিল নিকুঞ্জ যে তার দশ বছরের আলাপী পঞ্চানন গুঁই তার কাছ থেকে দেশলাই ধার নেবার সময়ও তাকে চিনতে পারেনি। নিকুঞ্জ অসম সাহসের সঙ্গে কয়েকটা কথাও বলে ফেলেছিল—'আপনি ওটা রাখতে পারেন। আমার কাছে আরেকটা দেশলাই আছে।' পঞ্চানন গলার স্বর শুনেও চেনেনি। একেই বলে আর্ট।

নিকুঞ্জ সাহার আর সব শখ চলে গিয়ে এটাই পোক্তভাবে রয়ে গেছে। শুধু রয়ে গেছে না, উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়ে শখটা নেশায় পরিণত হয়েছে। তার হাতে এখন সময়ও অঢেল। আগে একটা চাকরি ছিল। কলেজ স্ট্রীটে ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানিতে সে ছিল সেলসম্যান। সম্প্রতি তার এক জ্যাঠামশাই শেয়ার মার্কেটে অনেক টাকা করে গত হয়েছেন; তাঁর নিজের সন্তান ছিল না; স্ত্রীও মারা গেছেন সেভেন্টি টুতে। নিকুঞ্জকে তিনি উইল করে যে টাকা দিয়ে গেছেন তার ব্যাঙ্কের সুদ হয় মাসে সাড়ে সাতশো। কাজেই সেলসম্যানের চাকরিটা সে অক্লেশে ছাড়তে পেরেছে। এই জ্যাঠাই বলতেন, 'বই পড়ো নিকুঞ্জ, বই পড়ো। বই পড়ে না শেখা যায় এমন জিনিস নেই। ইস্কুলের দরকার হবে না, মাস্টারের দরকার হবে না—স্রেফ বই। লোকে এরোপ্লেন চালাতে শিখেছে বই পড়ে, একথাও শুনেছি।' জ্যাঠা নিজে বই পড়ে দুটি জিনিস শিখেছিলেন—হাত দেখা আর হোমিওপ্যাথি। দুটোই তিনি বেশ ভালো ভাবেই রপ্ত করেছিলেন বলে জানা যায়। নিকুঞ্জ তাঁর কথা মেনে নিয়েই বই পড়ে শিখেছিল চামড়ার কাজ আর ফোটোগ্রাফি। মাস ছয়েক আগে কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে মেক-আপ সম্বন্ধে একটা মোটা আমেরিকান বই দেখে সে কেনার লোভ সামলাতে পারেনি। সেইটে পড়ে এই নতুন শখটা তাকে পেয়ে বসে।

অথচ মেক-আপের যেটা আসল জায়গা—থিয়েটার—সে সম্বন্ধে নিকুঞ্জর কোনো উৎসাহই নেই। একবার মনে হয়েছিল—এ তো বেশ নতুন জিনিস শেখা

হল, এর থেকে একটা উপরি রোজগারের রাস্তা ধরলে কেমন হয়?

নব নট্ট কোম্পানির ভুলু ঘোষের সঙ্গে নিকুঞ্জর কিছুটা আলাপও ছিল। দুজনেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মেমবার, সেই সূত্রেই আলাপ। আমহার্স্ট স্ট্রীটে ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে কথাটা পাড়তে ভুলু ঘোষ বললেন, 'বেশ ত আছ নিকুঞ্জ, আবার থিয়েটার লাইনে আসার ইচ্ছে হল কেন? আর, আমাদের কোম্পানির কথা যদি বল, সেখানে অপরেশ দত্তকে সরিয়ে তুমি তার জায়গায় বসবে কি করে? সে লোক আজ ছত্রিশ বছর ধরে মেক-আপ করছে; পুরো আর্টটি তার নখের ডগায়। তোমার ছ'মাসের বিদ্যে শুনলে ত সে তোমার দিকে চাইবেই না—কথা বলা দূরের কথা। না হে—ওসব ভুলে যাও। সুখে যখন আছ, তখন ভূতের কিল ভোগ করবে কেন সাধ করে?'

নিকুঞ্জ সেইদিনই পেশাদার মেক-আপের চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে দেয়।

তাহলে মেক-আপ শিখে করবে কী সে? কার মেক-আপ করবে? চুল ছাঁটার সেলুনের মতো ত মেক-আপের সেলুন খোলা যায় না, যেখানে লোক পয়সা দিয়ে নিজের চেহারা পালটে নিতে আসবে!

তখনই নিকুঞ্জর মনে হয়—কেন, আমার নিজের চেহারা কী দোষ করল? সত্যি বলতে কি, তার নিজের চেহারায় কয়েকটা সুবিধে আছে—যাকে বলে ন্যাচারেল অ্যাডভানটেজেস। নিকুঞ্জর সবই মাঝারি। সে না-লম্বা না-বেঁটে, না-কালো না-ফরসা, না-চোখা না-ভোঁতা। যে নাক খাড়া তাকে ভোঁতা করা যায় না। যে বেশি লম্বা, তাকে বেঁটে করা যায় না, যে বেশি কালো, তাকে ফরসা বানাতে হলে যে পরিমাণ রঙের প্রলেপ লাগে তাতে মেক-আপ ধরা পড়ে যেতে বাধ্য।

দুদিন ধরে আয়নায় নিজের চেহারাটা স্টাডি করে নিকুঞ্জ তাই স্থির করল যে মেক-আপ সে নিজেকেই করবে, নিজের চেহারার উপরেই চলবে তার যত এক্স-পেরিমেণ্ট।

কিন্তু তারপর? এই মেক-আপের উদ্দেশ্যটা হবে কী?

উদ্দেশ্য হবে দুটি—এক, নিজের শিল্পচাতুরীকে পারফেকশনের সবচেয়ে উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়া; এবং দুই, লোকের চোখে ধুলো দেবার আনন্দ উপভোগ করা।

বই কেনার দিন-সাতেকের মধ্যেই নিকুঞ্জ মেক-আপের সরঞ্জাম কিনতে শুরু করে। বইয়েতেই সে জেনেছে ম্যাক্স ফ্যাক্টর কোম্পানির প্যান-কেক মেক-আপের মাহাত্ম্যের কথা। সে জিনিস আমেরিকায় তৈরি হয়, কলকাতায় আসে না। অথচ দিশি রং-এ নিখুঁত মেক-আপ সম্ভব নয়। নিকুঞ্জকে তাই যেতে হল প্রতিবেশী ডাক্তার বিরাজ চৌধুরীর কাছে। এই ডাক্তার চৌধুরীই একবার নিকুঞ্জর জনডিস সারিয়ে দিয়েছিলেন। এঁর ছেলে আমেরিকায় পড়াশুনা করে, নিকুঞ্জ খবর পেয়েছে সে বোনের বিয়েতে শিগগিরই দেশে আসছে।

ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে নিকুঞ্জ ভণিতা না করে সোজাসুজি বলল, 'আপনার ছেলে যদি একটি জিনিস আমার জন্য আনতে পারে; ও এলেই আমি দামটা দিয়ে দেব।'

'কী জিনিস?' জিগ্যেস করলেন ডাক্তার চৌধুরী।

'কিছু রং। মেক-আপের রং। আমি নাম লিখে এনেছি। এখানে পাওয়া যায় না।'

'বেশ ত। আপনি ডিটেলটা দিয়ে দিন, আমি ওকে পাঠিয়ে দেব।'

ম্যাক্স ফ্যাক্টরের রং এসে যায় তিন সপ্তাহের মধ্যেই। তার আগেই অবশ্য বাকি সব জিনিস কেনা হয়ে গেছে—তুলি, স্পিরিট গাম, ভুরু আঁকার কালো পেনসিল, ফোকলা দাঁত করার জন্য কালো এনামেল পেন্ট, পাকা চুল করার জন্য সাদা রং, পরচুলা লাগানর জন্য সূক্ষ্ম নাইলনের নেট। এ ছাড়া কিনতে হয়েছে বেশ কিছু আলগা চুল, যা ওই সূক্ষ্ম নেটের উপর একটা একটা করে বসিয়ে নিকুঞ্জ নিজে হাতে তৈরি করে নিয়েছে বিশ রকমের গোঁফ, বিশ রকমের দাড়ি আর বিশ রকমের পরচুলা। রুক্ষ, মসৃণ, সোজা, ঢেউ খেলানো, কাফ্রিদের মতো পাকানো—কোনো-রকম চুল বাদ নেই।

কিন্তু শুধু মুখ পালটালেই ত হল না, সেই সঙ্গে পোশাক না বদলালে চলবে কি করে? নিকুঞ্জর সাতদিন লেগেছে নিউ মার্কেট, বড়বাজার আর গ্রাণ্ট স্ট্রীট ঘুরে নিজের মাপ অনুযায়ী পোশাক জোগাড় করতে। রেডিমেড আর কটা জিনিস পাওয়া যায়? তাই দরজিকে দিয়েও বেশ কিছু পোশাক করিয়ে নিতে হয়েছে। আর শুধু জামা কাপড় ত নয়, পরিধেয় সব কিছুই। সাত রকমের চশমা, বারো রকম চটিজুতো স্যাণ্ডেল, দশ রকম টুপি—তার মধ্যে দারোগার টুপিও বাদ যায় না—পাগড়ির জন্য পাঁচ রকম কাপড়, পাঁচ রকম হাত ঘড়ি। শিখদের হাতের লোহা, তাগা, তাবিজ, মাদুলি, পৈতে, বোষ্টমের মালা, শাক্তের রুদ্রাক্ষ, ওস্তাদের কানে পরার নকল হীরে—কিছুই বাদ যায়নি।

আর কিনতে হয়েছে একটা বড় আয়না, আর তার ফ্রেমে বসানোর জন্য জোরালো বাল্‌ব। লোডশেডিং-এ যাতে কাজ বন্ধ না হয়ে যায় তার জন্য একটা ছোট জাপানী জেনারেটরও কিনতে হয়েছে নিকুঞ্জকে। চাকর নিতাইকে সে শিখিয়ে দিয়েছে সেটা কি করে চালাতে হয়।

কাজ শুরু হয় ষোলই অগ্রহায়ণ। তারিখটা নিকুঞ্জ ডায়রিতে লিখে রেখেছে। সকাল আটটা থেকে শুরু করে বিকেল সাড়ে চারটেয় মেক-আপ শেষ হয়। মোটামুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরই মেক-আপ নিতে হবে সেটা নিকুঞ্জ আগেই ঠিক করে রেখেছিল। রাস্তার ভিখিরি বা কুলি-মজুর সেজে ত লাভ নেই, কারণ মেক-আপ উৎরেছে কিনা সেটা পরীক্ষা হবে নিউ মহামায়া কেবিনে। সেখানে বসে চা খেতে পারে এমন লোক ত হওয়া চাই।

প্রথম দিনেই বাজিমাৎ। ঘন কালো ভুরু, আর তার সঙ্গে মানানসই ঘন কালো ঝুপো-গোঁফ-বিশিষ্ট মোক্তার সেজেছিল নিকুঞ্জ। সাদা প্যান্ট ও বহুব্যবহৃত কালো মোক্তারি কোট; হাতে একটা পুরোন ব্রীফ কেস, পায়ে সুকতলা খয়ে যাওয়া কালো শু আর ইলাসটিক-বিহীন সাদা মোজা। তারই টেবিলে এসে বসল পঞ্চানন। নিকুঞ্জ যতক্ষণ চা খেয়েছে, তার বুকের ধুকপুকুনি চলেছে সমানে। কিন্তু সামনে বসা অচেনা সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে একজন লোক যে কত কম কৌতূহলী হয়—বিশেষত সে লোকের যদি অন্য দিকে মন থাকে—সেটা নিকুঞ্জ সেদিন বুঝেছে। পঞ্চানন তার দিকে দেখেও দেখেনি। বাঁ হাতে রেস বুকের পাতা উলটে দেখেছে আর ডান হাতে চামচ দিয়ে অমলেট ছিঁড়ে খেয়েছে। নিকুঞ্জ যখন বয়ের কাছে বিল চাইল, তখনও পঞ্চাননের দৃষ্টি ঘুরল না তার দিকে। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, অদ্ভুত আনন্দ। নিকুঞ্জ সেদিনই বুঝেছিল যে আজ থেকে এটাই হবে তার জীবনের একমাত্র অকুপেশন।

সেদিন বাড়ি ফিরে একটা মজা হল। এটা যে হবে সেটা আগেই বোঝা উচিত



ছিল, কিন্তু নিকুঞ্জর খেয়াল হয়নি। শশীবাবু থাকেন একতলার সদর দরজার পাশের ফ্ল্যাটে। তাঁর বসার ঘর থেকে কে ঢুকছে না-ঢুকছে দেখা যায়। নিকুঞ্জ ফিরেছে সোয়া সাতটায়। লোডশেডিং হয়নি বলে দরজার সামনের প্যাসেজে আলো ছিল। মোক্তার-নিকুঞ্জ ঢুকতেই শশীবাবুর হাঁক এল, 'কাকে চাই?'

নিকুঞ্জ থামল। তারপর শশীবাবুর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এবার তারা মুখোমুখি। শশীবাবু আবার বললেন, 'কাকে খুঁজছেন মশাই?'

'নিকুঞ্জ সাহা কি এই বাড়িতে থাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দোতলার সিঁড়ি উঠে ডান দিকের ঘর।'

উত্তরটা দিয়ে শশীবাবু ঘুরে গেলেন, আর সেই ফাঁকে একটানে গোঁফ-ভুরু খুলে ফেলে নিকুঞ্জ বলল, 'একটা কথা ছিল।'

'বলুন,' বলেই নিকুঞ্জর দিকে ফিরে শশীবাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'সে কি—এ যে নিকুঞ্জ!'

নিকুঞ্জ শশীবাবুর ঘরে ঢুকে গেল। এঁকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। বাড়ির অন্তত একজন জানলে ক্ষতি নেই, বরং সুবিধেই হবে।

'শুনুন শশীদা, আমি এবার থেকে মাঝে মাঝে এইরকম মেক-আপ নিয়ে ফিরব। কোনোদিন ডাক্তার, কোনোদিন মোক্তার, কোনোদিন শিখ, কোনোদিন মারোয়াড়ি—বুঝছেন? বেরোব বিকেলে, ফিরব সন্ধেয়। আপনার ঘরে এসে মেক-আপটা খুলে ফেলব। ব্যাপারটা আমার-আপনার মধ্যেই থাক, কেমন?'

'কিন্তু হঠাৎ এ উদ্ভট শখ কেন? থিয়েটার-টিয়েটার—?'

'না না। থিয়েটার নয়। এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট। আপনাকে কনফিডেন্সে নিচ্ছি কারণ আপনি বুঝবেন। মোটকথা আপনি আর ছড়াবেন না ব্যাপারটা, এইটে আমার রিকোয়েস্ট।'

শশীবাবু সজ্জন ব্যক্তি, পাড়ার বঙ্কিম পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান, নিজেও বইয়ের পোকা। নিকুঞ্জর কথায় রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'কোনো বদ মতলব নেই যখন বলছ, তখন আর কি? কত লোকের ত কতরকম শখই থাকে।'

কাজটা মেহনতের ও সময়সাপেক্ষ, তাই সপ্তাহে দুদিনের বেশি মেক-আপ নেওয়া চলবে না এটা নিকুঞ্জ আগেই বুঝেছিল। তবে বাকি সময়টা সদ্ব্যবহার করতে বাধা নেই; নিকুঞ্জ সেই সময়টা শহরে ঘুরে বেড়িয়ে লোকজন স্টাডি করে। নিউ মার্কেট যে এ ব্যাপারে একটা স্বর্ণখনি সেটা একদিন গিয়েই বুঝেছে। তাছাড়া খেলার মাঠ, হিন্দি সিনেমার কিউ—এসব ত আছেই। ইন্টারেস্টিং টাইপের লোক দেখলেই নিকুঞ্জ খাতায় নোট করে নেয়, এমনকি কোনো ছুতো ক'রে সে-লোকের সঙ্গে দুটো কথাও বলে রাখে। 'কটা বাজল দাদা, আমার ঘড়িটা আবার..' অথবা 'এখান থেকে গড়িয়াহাট যেতে কত নম্বর বাস ধরব বলতে পারেন?'- এ ধরনের প্রশ্নেও যথেষ্ট কাজ হয়। যেদিন মেক-আপ থাকে না সেদিন বিকেলে সে স্বাভাবিক বেশেই চলে যায় নিউ মহামায়া কেবিনে। যে তিন-চারজন আলাপী আসে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে রাজা উজীর মেরে যথা-সময়ে ফিরে আসে তার বৃন্দাবন বসাক লেনের ফ্ল্যাটে। ছোকরা চাকর নিতাই অবশ্য বাবুর ব্যাপারটা জানে, বাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে এবং রীতিমতো উপভোগ করে। তবে চাকরটি যে খুব বুদ্ধিমান তা বলা চলে না।

'চিনতে পারছিস?'

'হ্যাঁ—!'

'মারব এক থাপ্পড়! তোর বাবু বলে চিনতে পারছিস?'

'আপনি ত বাবু বটেই। সে ত জানি।'

'তোর বাবুর এরকম গোঁফ, এরকম টাক? এরকম পোশাক পরে তোর বাবু? এবকম চশমা পরে? কাঁধে এরকম চাদর নেয়?'

নিতাই হাসিমুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে দরজায় হেলান দিয়ে। নিকুঞ্জ বুঝতে পারে মাথামোটা লোকেদের জন্য তার এই ছদ্মবেশ নয়। তারা এর আর্ট কোথায় তা ধরতে পারবে না।

কিন্তু শুধুমাত্র তিনজন কি চারজন বন্ধুকে ঠকিয়েই কি তার কাজ শেষ?

এ প্রশ্নটা কদিন থেকেই নিকুঞ্জকে ভাবিয়ে তুলেছে। সে বুঝেছে যে তার আকাঙ্ক্ষা ঊর্ধ্বগামী পথ নিতে চাইছে। তার আর্টের দৌড় কতটা সেটা জানার একটা গোপন বাসনা মাথা উঁচিয়ে উঠছে।

সেই বাসনা চরিতার্থ করার একটা সুযোগ এসে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই।

শশীবাবুর ঘরেই কথা হচ্ছিল এই ফ্ল্যাটবাড়ির কয়েকজন বাসিন্দার মধ্যে; নিকুঞ্জ সেখানে উপস্থিত। ভুজঙ্গবাবু একটু আধটু ধর্মচর্চা করেন, তার মধ্যে প্রাণায়াম, কুম্ভক রেচক, নাক দিয়ে জল টানা, এসব আছে। গুজব শোনা যায় তিনি নাকি সন্ন্যাসী হতে হতে সংসারী হয়ে পড়েন। তবে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ আছে তাঁর, কেদার-বদ্রী কাশী-কামাখ্যা সব ঘোরা আছে কুণ্ডু স্পেশালে। তিনিই বললেন তারাপীঠে এক তান্ত্রিক সাধু এসে আস্তানা গেড়েছেন যাঁর ক্ষমতা নাকি পৌরাণিক সাধুদের হার মানায়।

'নামটা কী বললেন?' জিজ্ঞেস করল ব্যাঙ্কের চাকুরে হরবিলাস।

'নাম বলিনি', বিরক্তভাবে বললেন ভুজঙ্গবাবু। রাগলে এঁর ভুরু উপরে

ওঠে, ফলে চশমা নাক দিয়ে হড়কে নিচে নেমে যায়।

'হেঁচকি বাবা কি?' প্রশ্ন করল হরবিলাস।

হেঁচকি বাবা নামে একজন সাধুর কথা কাগজে বেরিয়েছিল বটে। ইনি নাকি ভক্তদের সামনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ হঠাৎ এমন হেঁচকি তোলেন যে মনে হয় অন্তিমকাল উপস্থিত, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে এমন ভাব করেন যেন কিছুই হয়নি। অথচ উপস্থিত ডাক্তারেরাও বলেছেন এ-হেঁচকি মরণ-হেঁচকি ছাড়া কিছুই না।

ভুজঙ্গবাবু ডান হাতের তর্জনী দিয়ে চশমা নাকের উপর ঠেলে তুলে জানালেন সাধুর নাম কালিকানন্দ স্বামী।

'যাবেন নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন ইন্সিওরেন্সের দালাল তনয়বাবু। 'আপনি যান ত আমিও ঝুলে পড়ি আপনার সঙ্গে। সাধুদর্শনে বেশ একটা ইয়ে হয়। কলকাতার এই হোলসেল নোংরামি আর ভাল্লাগে না।'

ভুজঙ্গবাবু বললেন তিনি যাবেন বলেই স্থির করেছেন।

নিকুঞ্জ আর কিছু না বলে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল। তার ধমনীতে রক্ত যে বেশ দ্রুত চলাচল শুরু করেছে সেটা সে বেশ বুঝতে পারছে। তান্ত্রিক সাজতে হলে কী কী জিনিস লাগে, কী কী তার কাছে আছে, এবং কী কী জোগাড় করতে হবে সেটা জানা চাই।

তাক থেকে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী নিয়ে কপালকুণ্ডলার তান্ত্রিকের বর্ণনাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল নিকুঞ্জ। আজও এ বর্ণনার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সাধু সন্ন্যাসীদের চেহারা পৌরাণিক যুগে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। নিকুঞ্জ একবার বেনারস গিয়েছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে মনে হয়েছিল যে প্রাচীন ভারতবর্ষের চেহারাটা এই একটা জায়গায় এখনো ধরা রয়েছে।

নিকুঞ্জর প্ল্যান ঠিক হয়ে গেল।

তারাপীঠ হল বীরভূমে। রামপুরহাটে নিকুঞ্জর এক খুড়তুতো ভাই থাকে। সেইখানে সে চলে যাবে তান্ত্রিক মেক-আপের সরঞ্জাম নিয়ে। তারপর সেখান থেকে তৈরি হয়ে নিয়ে হাজির হবে তারাপীঠে। তারপর হবে পরীক্ষা। সাধু-বাবাজীদের মধ্যে সে বেমালুম মিশে যেতে পারে কিনা সেইটে তাকে দেখতে হবে। ভুজঙ্গবাবুরাও সেখানে থাকবেন; তাঁরাও তার ছদ্মবেশ ধরতে পারেন কিনা দেখা যাবে।

মেক-আপের অধিকাংশ জিনিসই নিকুঞ্জর ছিল, কেবল হাতে নেবার যষ্ঠি, চিমটে আর কমণ্ডলু ছাড়া। ঝাঁকড়া চুল আছে একটা, সেটাকে জটায় পরিণত করতে হবে। ও হয়ে যাবে; চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ভুজঙ্গবাবু সপরিবারে বুধবার রওনা দিচ্ছেন খবর পেয়ে নিকুঞ্জ মঙ্গলবার বেরিয়ে পড়ল। ভাই সন্তোষকে আগেই খবর দেওয়া ছিল, যদিও কেন যাচ্ছে সেটা নিকুঞ্জ জানায়নি। ভাইয়ের বয়স বত্রিশ, বাবা মারা গেছেন গত বছর। তিনি ছিলেন রামপুরহাটে পূর্ণিমা টকিজের মালিক। এখন সন্তোষই মালিকানা ভোগ করছে, এবং হিন্দি ছবি দেখিয়ে পয়সাও কামিয়েছে মন্দ না। হয়ত হিন্দি ছবি দেখার জন্যই সে নিকুঞ্জর প্ল্যানের মধ্যে একটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেল। বলল, 'তোমার কোন চিন্তা নেই নিকুঞ্জদা। আমার গাড়িতে করে সোজা নিয়ে গিয়ে তোমাকে একেবারে শ্মশানের মুখে নামিয়ে দেব।'

নিকুঞ্জের খেয়াল ছিল না যে তারাপীঠের শ্মশানেই হচ্ছে মন্দির, আর শ্মশানেই

যত সাধুদের আস্তানা। সন্তোষ বলাতে মনে পড়ল তারাপীঠের বিখ্যাত সাধু বামাক্ষ্যাপা তো শ্মশানেই সাধনা করতেন; ঠিক কথা।

বিষ্যুদবার দিন ভোর থেকে মেক-আপ শুরু করে দিল নিকুঞ্জ। দাড়ি গোঁফ জটা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচয় লোপ পেল। তারপর কপালে চন্দনের লেপ আর লাল ফোঁটা দিয়ে গলায় তিন গাছি বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা পরে গায়ে গেরুয়া বস্ত্র চাপানোর সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঢিপ্ করে এক প্রণাম করল নিকুঞ্জকে।

'ওফ্ফ্—নিকুঞ্জদা—এ যা হয়েছে না! কার বাপের সাধ্যি তোমাকে চেনে। নেহাত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি বলে, নইলে আমিও ব্যোম্কে যেতুম।'

এই ক মাসে হাত পেকেছে, তাই দুপুর আড়াইটার মধ্যে মেক-আপ হয়ে গেল। চিমটে-কমণ্ডলু নতুন কেনা, তাই তাদেরও একটু মেক-আপ করে পুরোন করে নেওয়া হল। চারটের মধ্যে সম্পূর্ণ তৈরি নিকুঞ্জ সাহা ওরফে ঘনানন্দ মহারাজ। একটা নাম না দিলে চলে না, যদিও নিকুঞ্জ মাঝে মাঝে বম্ বম্ ছাড়া কথা বলবে না বলেই স্থির করেছে। সাধুরা অন্য জগতের মানুষ; সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কথা বলতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নামটা দরকার হচ্ছে সন্তোষের জন্য। সেই বলেছে, 'নিকুঞ্জদা, তুমি যখন গাড়ি থেকে নামবে, লোকে ত ঘিরে ধরবেই। তখন যদি জিগ্যেস করে কে, তার জন্য একটা নামের দরকার।' ঘনানন্দ দিব্যি গম্ভীর নাম। সন্তোষ এখন নিশ্চিন্ত।

সন্তোষ সচরাচর নিজেই গাড়ি চালায়। কিন্তু এবার সে একটি ড্রাইভার সঙ্গে নিল। বলল, 'আমাকে সাধুবাবার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে হবে, গাড়িটা কিন্তু আপনার জিম্মায় থাকবে।'

একটা কথা নিকুঞ্জ সন্তোষকে না বলে পারল না। 'ওখানে পৌঁছানর পর আমি কিন্তু একা হয়ে যেতে চাই। আমার লক্ষ্য হবে কালিকানন্দ। তাঁর আশে-পাশে আরো পাঁচজন সাধুবাবা কি থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। আমি সেই দলে গিয়ে ভিড়ব। তুই বরং আলগা থেকে ভক্তদের দলে গিয়ে বসে পড়িস।'

'তোমার কোনো চিন্তা নেই, নিকুঞ্জদা।'

সন্তোষের গাড়ি যখন তারাপীঠ শ্মশানে পৌঁছাল, তখন সূর্য ডুবতে আরো আধ ঘণ্টা বাকি। আর পাঁচটা পীঠস্থানের মতোই এখানেও লোকের ভিড়, পাণ্ডার ভিড়, পথের দুধারে লাইন করা দোকানে গাঁদা ফুল আবির কুমকুম বই ক্যালেণ্ডার চা বিস্কুট তেলেভাজা মাছিবসা-জিলিপি ইত্যাদি সবই রয়েছে।

নিউ মহামায়া কেবিনের পর নিকুঞ্জর এখানে এসে এক আশ্চর্য নতুন অভিজ্ঞতা হল। গেরুয়া পরা লোক দেখলেই লোকের মনে যে কী করে ভক্তি ভাব জেগে ওঠে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। গাড়ি থেকে নামা মাত্র নিকুঞ্জ দেখল যে গড় করা শুরু হয়ে গেছে। ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ কেউ বাদ নেই। আপনা থেকেই আশীর্বাদের ভঙ্গিতে নিকুঞ্জর হাতটা উঠে সামনের দিকে এগোতে শুরু করল। শেষে এমন হল যে হাত টেনে নেবারও অবসর নেই। পাশে সন্তোষ না থাকলে তাকে বোধহয় এক জায়গাতেই আটকে পড়তে হত। 'দাদা সরুন, মা পথ দিন, পথ দিন'—এই করে সন্তোষ কোনো মতে একটা অপেক্ষাকৃত জনবিরল জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলল নিকুঞ্জকে। এখানে চারিদিকে সাধুর অভাব নেই, ফলে আলাদা করে নিকুঞ্জর দিকে লোকের দৃষ্টি পড়ার কোনো কারণ নেই।

এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে নিকুঞ্জ দেখল যে কিছুদূরে একটা বটগাছের



নিচে একটা ভিড় দেখা যাচ্ছে। গেরুয়া ছাড়াও অন্য রং রয়েছে সেখানে। সন্তোষ বলল, 'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি দেখে আসছি ওইখেনেই কালিকানন্দ বসেছেন কিনা। ওঁর সামনে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে তবে আমার কাজ শেষ। আমি আপনাকে চোখে চোখে রাখব, তারপর যখন যাবার ইচ্ছে হবে তখন আমাকে ইশারা করলেই আমি বুঝতে পারব।'

সন্তোষ দেখে এসে ফিস্ ফিস্ করে জানাল ওই ভিড়টা কালিকানন্দর জন্যই বটে। 'আপনি সোজা এগিয়ে যান নিকুঞ্জদা। কুছ পরোয়া নেই।'

পরোয়া নিকুঞ্জের এমনিতেও নেই। সে এখানে এসে অবাধ অত্যন্ত সহজ বোধ করছে। সেই সঙ্গে একটা পরম তৃপ্তির ভাব। মেক-আপে তার জুড়ি কেউ নেই সে বিশ্বাসটা তার মনে আজ পাকা হয়েছে।

নিকুঞ্জ এগিয়ে গেল ভিড়ের দিকে। পথে দু একজন গড় করল। নিকুঞ্জ যথারীতি হাত বাড়িয়ে আশীর্বাদ করল।

উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত বাণী কিছুক্ষণ থেকেই শোনা যাচ্ছে; নিকুঞ্জ এগোনর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ক্রমশ জোর হয়ে আসছে। আরেকটু এগিয়ে যেতেই সে দেখতে পেল কালিকানন্দকে। বাঘের মত চেহারা বটে, এবং বাঘছালের উপরেই বসেছেন তিনি। তিনিই বাণী শোনাচ্ছেন ভক্তদের। সবই ছেঁদো কথা, কিন্তু বলার ঢং-এ বিশেষত্ব আছে। আর সেই সঙ্গে চোখের দৃষ্টিতেও। মণিকে ঘিরে যে সাদা অংশ সেটা সাদা নয়, গোলাপী। গাঁজা খাওয়ায় ফল কি? হতেও পারে।

ভক্তের সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাটের বেশি নয়, তবে একজন দুজন করে ক্রমেই বাড়ছে। ওই ত ভুজঙ্গবাবু আর তাঁর স্ত্রী! তনয়বাবুও নিশ্চয়ই আছেন ভিড়ের মধ্যে। ভুজঙ্গবাবুরা মনে হয় বেশ সকাল সকাল এসেছেন, কারণ তাঁদের স্থান ভক্তদের একেবারে প্রথম সারিতে।

কালিকানন্দের দুপাশে এবং পিছনে দশ বারো জন গেরুয়াধারী বসেছেন,

তাঁদের সকলেরই গোঁফদাড়ি জটা, রুদ্রাক্ষের মালা, সর্বাঙ্গে ভস্ম। অর্থাৎ নিকুঞ্জর সঙ্গে তাঁদের চেহারার তফাত করা প্রায় অসম্ভব।

নিকুঞ্জ ভিড়ের পিছন দিয়ে এগিয়ে গেল সাধুদের দলের দিকে। কোত্থেকে যেন একটা গান ভেসে আসছে—

কে হরি বোল হরি বোল বলিতে যায়
যা রে মাধাই জেনে আয়
বুঝি গৌর যায় আর নিতাই যায়
যাদের সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়—

হঠাৎ গানটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেন? কারণ আর কিছুই না—কালিকানন্দের কথা থেমে গেছে।

নিকুঞ্জের দৃষ্টি গেল সাধুবাবার দিকে।

কালিকানন্দ তার দিকেই চেয়ে আছে। এক দৃষ্টে। রাঙা চোখে।

নিকুঞ্জের হাঁটা থেমে গেছে।

অন্যান্য সাধু আর ভক্তদের দৃষ্টিও তার দিকে।

এবার কালিকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠে প্রশ্ন এল, 'বাবাজীর ভেক ধরা হয়েছে, অ্যাঁ? গেরুয়া পরলেই সাধু হয়? গলায় মালা পরলেই সাধু? গায়ে ছাই মাখলেই সাধু? অ্যাঁ? তোর আস্পর্ধা তো কম না? তোর জটা ধরে যদি টান দিই, তখন কী হবে? কোথায় যাবে তোর সাধুগিরি?'

চোখের পলকে সন্তোষ হাজির নিকুঞ্জের পাশে।

'আর নয় দাদা। সোজা গাড়িতে।'

নিকুঞ্জের সমস্ত দেহ অবশ, কিন্তু তাও পালানো ছাড়া পথ নেই। সন্তোষের কাঁধে ভর করে প্রায় চোখ বন্ধ করে সে রওনা দিল শ্মশানের গেটের উদ্দেশে। কান ত খোলা, তাই কালিকানন্দের শেষ কথাগুলো না শুনে পারল না—'এই ভন্ডামির ফল কী তা জান তুমি, নিকুঞ্জ সাহা?'

কলকাতায় পেঁাছে বাসা বদল করতে হল। আর এ তল্লাটেই নয়। ভুজঙ্গবাবুর সামনে ঘটেছে ঘটনাটা; তিনি এসেই হাটে হাঁড়ি ভাঙবেন। তখন আর টিটকিরিতে কান পাতা যাবে না। ভবানীপুরে কাঁসারিপাড়া লেনে একটা ফ্ল্যাট পাওয়া গেল ভাগ্যক্রমে। ফ্ল্যাট মানে দেড়খানা ঘর। ভাড়া আড়াইশো টাকা। বাপ্‌রে বাপ্—তান্ত্রিকের কী তেজ, কী অন্তর্দৃষ্টি! পাদ্রী, পুরুত, মোল্লা, দরবেশ—এই সব মেক-আপের যা সরঞ্জাম ছিল নিকুঞ্জর কাছে, সব বাক্স থেকে বার করে নিয়ে কাছেই আদিগঙ্গার জলে ফেলে দিল সে।

তিন হপ্তা গেল আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে। ইতিমধ্যে নতুন পাড়ায় আলাপী হয়েছে দু একজন। এখানেও রয়েছে বাড়ি থেকে আধমাইলের মধ্যে বড় রাস্তায় একটি রেস্টোরান্ট, নাম পরাশর কেবিন। এখানে কেউই জানে না নিকুঞ্জের কলঙ্কময় ইতিহাস—তারকবাবু, নগেন মাস্টার, শিবু পোদ্দার। শিবু আবার থিয়েটারে পার্ট করে। নিকুঞ্জকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল একদিন তপন থিয়েটারে 'আগুনের ফুলকি' দেখাতে। 'দেখবেন কেমন ফার্স্ট ক্লাস মেক-আপ নিই', যাবার আগে বলেছিল শিবু। নিকুঞ্জ দেখে হাসবে না কাঁদবে ঠিক করতে পারেনি। এ-ই মেক-আপ! এরা কি ভালো মেক-আপ দেখেছে কোনোদিন?

আমার মেক-আপ দেখলে ত এদের লজ্জায় মাথা হে'ট হয়ে যাবে!

পরক্ষণেই অবিশ্যি মনে পড়ল তারাপীঠের অভিজ্ঞতার কথা। তবে, তান্ত্রিক-দের অলৌকিক ক্ষমতার কথা ত শোনাই যায়। এতে অবাক হবার কিছু নেই। নিকুঞ্জর চালে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল, এই যা।

কিন্তু তাই বলে কি তার এত সাধের অকুপেশনটি একেবারে বরবাদ করে দিতে হবে? সে হয় না, হতে পারে না। আরো কত কী সাজতে বাকি আছে! যেমন, একটা সত্যি করে ষণ্ডা চরিত্র এখনো সাজা হয়নি। এক তান্ত্রিক ছাড়া যা সেজেছে সবই নিরীহ অমায়িক চরিত্র—যাদের দিকে এমনিতেই লোকের দৃষ্টি যায় না। চোখ যাবে অথচ চেনা যাবে না—তেমন একটা চরিত্রের মেক-আপ না করলে আর সত্যি করে সাফল্যের পরীক্ষা হবে কি করে?

কেমন হবে এই ষণ্ড চরিত্র? মাথায় কদম-ছাঁট চুল, মুখে চার দিনের দাড়ি, চোখের নিচে একটা ক্ষতচিহ্ন—যাকে বলে 'স্কার'—নাকটা একটু ভাঙা—মুষ্টি-যোদ্ধার মতো—হাতে উলকি, গলায় চেন, পরনে বোতাম ছাড়া চেক শার্ট আর বর্মার লুঙ্গি।

তারাপীঠের অভিজ্ঞতার পর নিকুঞ্জর আর ছদ্মবেশের ত্রিসীমানায় যাওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু শখটা বোধহয় এমনই মজ্জাগত যে কাজের বেলা দেখা গেল সে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বসে গেছে আবার আয়নার সামনে।

সকালবেলা চা খেয়েই কাজে লেগে যাওয়ার ফলে সেদিন আর নিকুঞ্জর খবরের কাগজটা দেখা হয়নি। ফলে খিদিরপুরে জোড়া খুনের খবরটা, এবং পলাতক আততায়ী ডাকসাইটে গুণ্ডা বাঘা মণ্ডলের ছবিটাও দেখা হয়নি। যদি হত তাহলে অবিশ্যি নিকুঞ্জ মেক-আপটা অন্যরকম ভাবে করত। বাঘা মণ্ডলের ছবি মাস ছয়েক আগেও একবার বেরিয়েছিল কাগজে। সেটা একটা দুঃসাহসিক ডাকাতির পরে। সে বারও বাঘা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিল। কাগজে ছবি ছাপার উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে সতর্ক করা। সেই প্রথমবারের ছবি কি নিকুঞ্জ দেখেছিল, আর সেই চেহারা তার মনের অবচেতনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল? না হলে আজ সে হুবহু বাঘা মণ্ডলের ছদ্মবেশ নেবে কেন?

ছবি দেখে থাকলেও, বাঘা সংক্রান্ত ঘটনাবলী নিশ্চয়ই নিকুঞ্জর জানা ছিল না। যদি থাকত তাহলে তাকে এসে টেবিলে বসতে দেখে যেভাবে পরাশর কেবিন খালি হয়ে গেল, সেটা তার মনে কোনো বিস্ময়ের সৃষ্টি করত না।

ব্যাপারটা কী? এরা এরকম করছে কেন? ম্যানেজার উঠে কোথায় গেলেন? বয়টা ওই কোণে ওরকম ফ্যাকাসে মুখ করে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে কেন?

ম্যানেজার যে পাশের ডাক্তারখানায় গিয়েছেন পুলিশে ফোন করতে এবং সেই ফোন যে পুলিশ ভ্যানকে চুম্বকের মতো টেনে আনবে নিকুঞ্জের পাড়ায়, সেটা আর নিকুঞ্জ জানবে কি করে? তবে এমনও দেখা যায় যে একজন লোকের চরম সংকটের মুহূর্তে তার উদ্ধারকল্পে ভাগ্যদেবতা পুরো হাতটা না হলেও, অন্তত একটা আঙুল তার দিকে বাড়িয়ে দেন। সেই আঙুলই হল নিকুঞ্জর পাশের চেয়ারে পড়ে থাকা একটি দৈনিক কাগজ। কাগজটা পুরো দেখারও দরকার নেই: যে পাতায় সেটা খোলা রয়েছে, তাতেই রয়েছে খুনী বাঘা মণ্ডলের ছবি, আর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত গরম খবর।

এই মুখই আজ নিকুঞ্জের আয়নায় তারই চোখের সামনে ক্রমে ফুটে উঠেছে।

নিকুঞ্জর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও কাগজটা কাছে টেনে এনে খবরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেবার লোভ সে সামলাতে পারল না। আর নেওয়ামাত্র সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে দ্রুতপদে (দৌড়ালে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে) কাঁসারিপাড়া লেনে নিজের বাসায় গিয়ে ঢুকতে সময় লাগল দশ মিনিট। একটা গাড়ির শব্দ সে পিছন থেকে পেয়েছে, এবং ঠিকই সন্দেহ করেছে সেটা পুলিশ ভ্যান—কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত করেনি। আসুক পুলিশ। পুলিশই বোকা বনবে। তারা সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় পৌঁছানর আগেই নিকুঞ্জর ছদ্মবেশ উধাও হয়ে যাবে। নিকুঞ্জ সাহা ত কোনো অপরাধ করেনি, করেছে বাঘা মণ্ডল।

ঘরে ঢুকে চাকরকে চায়ের জল চাপাতে বলে নিকুঞ্জ দরজাটা খিল দিয়ে বন্ধ করে দিল। ওই যাঃ!—লোড শেডিং। এখন জাপানী জেনারেটর চালাতে গেলে সময় লাগবে।

কুছ পরোয়া নেই। মোমবাতি আছে। কিন্তু আগে জামাটা ছেড়ে ফেলা উচিত। সে কাজটা অন্ধকারেই হবে।

নিকুঞ্জ এক নিমেষে লুঙ্গি শার্ট কালো কোট ছেড়ে খাটের উপর ছুঁড়ে ফেলে এক ঝটকায় আলনা থেকে পায়জামাটা নামিয়ে নিয়ে সেটাকে পরে ফেলল। তারপর দেশলাইয়ের আলোয় মোমবাতিটা দেরাজ থেকে বার করে সেটাকে জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখল।

এখনো পুলিশ ভ্যানের কোনো শব্দ নেই। পুলিশ হয়ত পাড়ায় নেমে খোঁজ নিচ্ছে কোন্ বাড়িতে ঢুকেছে বাঘা মণ্ডল। এ বাড়ির লোক অন্তত তাকে ঢুকতে দেখেনি। সামনের বা আশেপাশের বাড়ির কথা নিকুঞ্জ জানে না।

এই সব চিন্তার মধ্যেই নিকুঞ্জ হাত চালাতে শুরু করল। প্রথমে নকল গোঁফ।

নকল গোঁফ?

নকল যদি হবে ত টানলে খোলে না কেন? স্পিরিট গাম দিয়ে আটকানো গোঁফ ত এক টানেই খুলে যায়—তবে?

মোমবাতিটা মুখের কাছে এনে আয়নার দিকে ঝুঁকতে নিকুঞ্জর রক্ত জল হয়ে গেল।

এ গোঁফ ত নকল বলে মনে হয় না! এ যে তার চামড়া থেকেই গজিয়েছে! আঠার কোন চিহ্ন ত এ গোঁফে নেই!

এ পরচুলাও ত পরচুলা নয়—এ যে তার নিজেরই চুল? এমনকি চারদিনের যে গজানো দাড়ি, যে দাড়ি সে একটি একটি করে গালে লাগিয়েছিল—তাতেও ত কৃত্রিমতার কোনো চিহ্ন নেই।

আর চোখের তলার ওই ক্ষতচিহ্ন? কোন ক্ষণজন্মা মেক-আপ শিল্পীর ক্ষমতা এমন ক্ষতচিহ্ন তৈরি করে রং তুলি আঠা আর প্লাস্টিসিনের সাহায্যে? এ তো সেই উনিশ বছর আগে এণ্টালির গাঁজা পার্কে বদ্রু শেখের সঙ্গে হাতাহাতির সময় ছুরির আঘাতের ফল! বাঘা তখন বাঘা হয়নি, তখন সে রাধু মণ্ডল, বয়স একুশ, সবে গুণ্ডামিতে তালিম নিচ্ছে মেঘনাদ রক্ষিতের কাছে।

দরজা ভেঙে ঢুকতে হল পুলিশকে। মাটিতে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা



বাঘা মণ্ডলের দিকে টর্চ ফেলে দারোগা চাকর নিতাইকে জিগ্যেস করলেন, 'এই লোক কি এ বাড়িতেই থাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি ত আমার মনিব।'

'কী নামে জান ওঁকে?'

'নিকুঞ্জবাবু। সাহাবাবু।'

'হুঃ!—ভদ্রলোক সাজা হয়েছে!' ব্যাঁকা হাসি হেসে বললেন দারোগাবাবু। তারপর কনস্টেবলের দিকে ফিরে বললেন, 'ওকে ধরে বেশ করে ঝাঁকাও ত দেখি। হুঁশ ফিরুক, তারপর বাকি কাজ।'

রিভলভার বার করে তাগ করে রইলেন দারোগা বেহুঁশ আততায়ীর দিকে।

ঝাঁকানি দিতেই প্রথমে বাঘা মণ্ডলের পরচুলাটা খসে মাটিতে পড়ল। তারপর গোঁফটা। তার প্লাস্টিসিন দিয়ে সযত্নে তৈরি ক্ষতচিহ্ন ও নাকের বাড়তি অংশটা উঠে এল নেট সমেত।

ততক্ষণে অবিশ্যি নিকুঞ্জ সাহার জ্ঞান ফিরেছে।

কাপালিকের ধমকানিতে যে কাজ হয়নি, আজ পুলিশের শাসানিতে তা হল।

নিকুঞ্জ এখন বই পড়ে মৃৎশিল্প বা ক্লে মডেলিং শিখছে। গঙ্গা কাছেই, নিতাই সেখান থেকে মাটি এনে দেয়। নিকুঞ্জর ইচ্ছা নিতাই হবে তার প্রথম মডেল।

অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য

॥ ১ ॥

"আপনি ত আমার লেখা শুধরে দেন," বললেন লালমোহনবাবু, "সেটা আর এবার থেকে দরকার হবে না।"

ফেলুদা তার প্রিয় সোফাটায় পা ছড়িয়ে বসে রুবিক্স কিউবের একটা পিরামিড সংস্করণ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল; সে মুখ না তুলেই বলল, "বটে?"

"নো স্যার। আমার পাড়ায় এক ভদ্রলোক এয়েচেন, কাল পার্কে দেখা হল। এক বেঞ্চিতে বসে কথা বললুম প্রায় আধ ঘণ্টা। গ্রেট স্কলার। নাম মৃত্যুঞ্জয় সোম।"

"স্কলার?"

"স্কলার। বোধহয় হার্বার্ট ইউনিভার্সিটির ডবল এম. এ., বা ওই ধরনের একটা কিছু।"

"উফ্‌ফ্‌!" ফেলুদা এবার মুখ না তুলে পারল না। "হার্বার্ট নয় মশাই, হার্ভার্ড, হার্ভার্ড!"

"তাই হবে। হার্ভার্ড।"

"হার্ভার্ড সেটা বুঝলেন কী করে? নাকিসুরে মার্কিন মার্কা ইংরিজি বলেন ভদ্রলোক?"

"ইংরিজিটা একটু বেশি বলেন। নাকিসুর কিনা লক্ষ করিনি। তবে বিদ্বান লোক। থাকেন বহরমপুর। একটা বই লিখছেন, তাই নিয়ে রিসার্চ করবেন বলে কদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। চেহারাতে বেশ একটা ইয়ে আছে। ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, চোখে সোনার বাই-ফোক্যাল, জামাকাপড়ও ধোপদুরস্ত। আমার 'হণ্ডুরাসে হাহাকার'টা পড়তে দিয়েছিলুম। চৌত্রিশটা মিসটেক দেখিয়ে দিলেন। তবে বললেন ভেরি এনজয়েব্‌ল।"

"তাহলে আর কী। আপনার পেট্রল খরচা অনেক কমে যাবে এবার থেকে। আর গড়পার-বালিগঞ্জ ঠ্যাঙাতে হবে না।"

"তবে ব্যাপারটা হচ্ছে কি—"

ব্যাপারটা কী হচ্ছে সেটা আর জানা গেল না, কেননা ঠিক এই সময় এসে পড়লেন ফেলুদার মক্কেল অম্বর সেন। ন'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আমাদের কলিং বেল বেজে উঠল।

অম্বর সেনের বয়স মনে হয় পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, ফরসা রং, দাড়িগোঁফ কামানো, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা, গায়ে পাঞ্জাবি আর ধুতির উপর একটা পুরোন জামেওয়ার শাল। কাশ্মীরী শাল যে কতরকম হয় সেটা সেদিন ফেলুদার সঙ্গে মিউজিয়ামে গিয়ে দেখে এসেছি।

অম্বর সেন ফেলুদার মুখোমুখি চেয়ারে বসে বললেন, "আপনিও ব্যস্ত মানুষ, আমিও ব্যস্ত। কাজেই সময় নষ্ট না করে সোজা কাজের কথায় চলে যাওয়াই ভাল। আগে এই জিনিসটা দেখুন।"

পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। খাতা থেকে ছেঁড়া একটা পাতা, সেটাকে দলা করে পাকানো হয়েছিল, তারপর আবার হাত বুলিয়ে মসৃণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কাগজটাতে গোটা অক্ষরে লাল কালি দিয়ে লেখা—"আমার সর্বনাশের শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হও। আর সাতদিন মেয়াদ। পালিয়ে পথ পাবে না।"

কাগজটা নেড়েচেড়ে দেখে ফেলুদা প্রশ্ন করল, "কীভাবে পেলেন এটা?"

"আমার বাড়িতে একতলায় আমার কাজের ঘর," বললেন ভদ্রলোক, "রাত্তিরে এসে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ডেস্কের উপর ফেলে দিয়ে গেছে। সকালে আমার চাকর লক্ষ্মণ এটা পেয়ে আমার কাছে নিয়ে আসে।"

"আপনার ঘর কি রাস্তার উপর?"

"না। ঘরের বাইরে বাগান, তারপর কম্পাউন্ড ওয়াল, তারপর রাস্তা। তবে দেয়াল টপকানো যায়।"

"সর্বনাশের কথা যে বলছে সেটা কী?"

অম্বর সেন মাথা নাড়লেন।

"দেখুন মিস্টার মিত্তির, আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। আমার পেশা হল ব্যবসা, তবে আসল কাজ আমার ভাইই করে। আমার পাঁচ রকম অন্য শখ আছে, সেই সব নিয়ে থাকি। সজ্ঞানে কারুর কখনো কোনো সর্বনাশ করেছি বলে ত মনে পড়ে না। অন্তত এমন সর্বনাশ নিশ্চয়ই নয় যেটা এই হুমকি-চিঠিকে জাস্টিফাই করতে পারে। ব্যাপারটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে।"

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ ভেবে বলল, "অবিশ্যি এটা এক ধরনের রসিকতাও হতে পারে—যাকে বলে প্র্যাকটিক্যাল জোক। আপনার পাড়ায় কাছাকাছির মধ্যে মস্তান ছেলেদের আস্তানা আছে?"

"আমরা থাকি পাম এভিনিউতে," বললেন অম্বর সেন। "পুব দিকে কিছু দূরে একটা বস্তি আছে, সেখানে ওই ধরনের ছেলে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়।"

"পুজোর চাঁদার জন্য হামলা করে না?"

"তা করে, কিন্তু চাঁদা ত আমরা নিয়মিত দিই।"

শ্রীনাথ চা এনেছে, তাই কাজের কথা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হল। লালমোহনবাবু দুবার বিড়বিড় করে "রিভেঞ্জ" কথাটা বললেন। ফেলুদা সেই সুযোগে আমাদের দুজনের সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিল।

"আপনিই বিখ্যাত লালমোহন গাঙ্গুলি?"

"হেঁ হেঁ।"

ভদ্রলোক বেশ তৃপ্তি সহকারে চায়ে চুমুক দিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, "আসলে আপনার বিষয় আমি আপনার কাহিনীগুলো থেকেই জেনেছি। তাই মনে হল আপনার কাছেই আসি।"

"পুলিশে খবর দেননি?" জিগ্যেস করল ফেলুদা।

"আমার ভাই অবিশ্যি পুলিশের কথাই বলেছিল, কিন্তু আমি আবার এসব ব্যাপারে একটু আন-অর্থডক্স। প্রচলিত নিয়মগুলো চট্‌ করে মানতে মন চায় না। আর সত্যি বলতে কী, এখনো বোধহয় অতটা বিচলিত হবার কারণ ঘটেনি।

আপনার কাছে এলাম, তার একটা কারণ আপনাকে দেখারও একটা ইচ্ছে ছিল। আমাদের পরিবারের মোটামুটি সকলেই আপনাকে নামে চেনে।"

"পরিবারে আর কে কে আছেন?"

"আমার ভাই অম্বুজ আছে। সে বিয়ে করেছে, আমি করিনি। অম্বুজের স্ত্রী আছে, একটি মেয়ে আছে বছর দশেকের—ছেলে দুটি বড়, তারা বাইরে থাকে—তাছাড়া আমার বিধবা মা আছেন, আর আছে আমাদেরই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সে আমাদেরই বাড়িতে মানুষ। ফ্যামিলি মেমবার বলতে এই; তার বাইরে তিনজন চাকর, একটি ঠিকে ঝি, রান্নার লোক, মালী, দারোয়ান আর ড্রাইভার। আমরা থাকি ফাইভ বাই ওয়ান পাম এভিনিউতে। বাবা ছিলেন নাম-করা হার্ট স্পেশালিস্ট অনাথ সেন।"

ফেলুদা একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব করছে দেখে ভদ্রলোক বললেন, "আপনাকে আমি শুধু ব্যাপারটা জানিয়ে গেলাম। হতে পারে এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল জোক ছাড়া আর কিছুই না; তবে কী জানেন, এ ধরনের রসিকতার টারগেট বিখ্যাত ব্যক্তিদের মাঝে মাঝে হতে হয় ঠিকই, কিন্তু আমি ত আর তেমন কেউ-কেটা নই, তাই..."

ফেলুদা বলল, "বুঝতেই পারছেন, এ হুমকি যদি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হয় তাহলে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। যাই হোক--আপাতত এই চিঠিটা আমি রাখতে পারি ত?"

"নিশ্চয়ই। ওটা ত আপনাকে দেবার জন্যেই আনা।"

এমন একটা হুমকি-চিঠি নিয়ে অম্বর সেনের ফেলুদার কাছে আসাটা একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হচ্ছিল, পরদিন সকালে পাম এভিনিউ থেকে যে ফোনটা এল, তাতে সমস্ত ব্যাপারটা একটা অন্য চেহারা নিল।

বসবার ঘর থেকে ফেলুদার ঘরে কলটা ট্রান্সফার করে দিয়ে কান লাগিয়ে যা শুনলাম তা হল এই—

"কে, মিস্টার মিত্তির?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমার নাম অম্বুজ সেন। কাল আমার দাদা বোধহয় আপনার ওখানে গেস্লেন একটা হুমকি-চিঠির ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।"

"ওয়েল, হি ইজ মিসিং।"

"মানে?"

"দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"পাওয়া যাচ্ছে না?"

"না। দাদা রোজ ভোরে গাড়িতে করে বেরোন; গঙ্গার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তারপর মাইল দুয়েক হাঁটেন। আজও গেস্লেন, কিন্তু আজ আর ফেরেননি।"

"সে কী!"

"ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছে এক ঘণ্টা ওয়েট করার পর। ও তন্নতন্ন করে খুঁজেও দাদার দেখা পায়নি।"

"পুলিশে জানাননি?"

"সেখানে একটা গোলমাল আছে মিঃ মিত্তির। আমার মা'র বয়স আশি, শরীরও ভাল নেই। ওঁকে দাদার ব্যাপারটা নিয়ে এখনো কিছুই জানাইনি। পুলিশ এলেই কিন্তু ব্যাপারটা আর চাপা থাকবে না। তখন ওঁকে সামলানো মুশকিল হবে। কাজেই আমাদের ইচ্ছা কেসটা আপনিই হ্যান্ডল করুন। আপনার উপর আমাদের পুরো ভরসা আছে। অবশ্য আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমরা দেব।"

"আমি তাহলে একবার আপনাদের ওখানে আসছি। অসুবিধা হবে না ত?"

"মোটেই না। আপনি এখনই চলে আসুন। আমাদের বাড়ির নম্বরটা জানেন ত?"

"ফাইভ বাই ওয়ান পাম এভিনিউ ত?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।"

॥ ২ ॥

সাহেবি ধাঁচের গাড়িবারান্দাওয়ালা দোতলা ছড়ানো বাড়ি, সামনে একটা ছোট বাগান, পিছনেও সবুজ দেখে মনে হল বোধহয় টেনিস কোর্ট জাতীয় কিছু আছে। গেটের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে অম্বরবাবুর বাবার নাম, নামের পরে অনেকগুলো ইংরিজি অক্ষর, কমা, ফুলস্টপ। সব শেষে ব্র্যাকেটের মধ্যে 'এডিন' কথাটা দেখে বুঝলাম ভদ্রলোককে স্কটল্যান্ড যেতে হয়েছিল ডাক্তারি পড়তে।

যিনি আমাদের ট্যাক্সির শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গে অম্বরবাবুর আদল আছে ঠিকই, কিন্তু ইনি বেঁটে, মোটা আর কালো। অর্থাৎ মুখের মিল বাদ দিলে ইনি অম্বরবাবুর ঠিক উল্টো।

আমাদের দেখে ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটে উঠলেও, দুশ্চিন্তার ফলে সেটা সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল।

"আসুন ভিতরে।"

শ্বেতপাথরের মেঝেওয়ালা ল্যান্ডিং পেরিয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম। এখানেও মার্বল, তার উপর কার্পেট, আর তার উপর দামী দামী ফারনিচার। যে সোফায় বসলাম, সেটার গদি এত নরম যে, আমার ভারেই প্রায় ছ ইঞ্চি বসে গেল।

"রুনা, এসো।"

একটি ফ্রক-পরা মেয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক চোখে চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে। অম্বুজবাবু ডাকতেই সে গুটি গুটি ঘরের ভিতর এগিয়ে এল।

"ইনি কে জানো?" জিগ্যেস করলেন অম্বুজবাবু।

"ফেলুদা," চাপা গলায় উত্তর এল।

"আর ইনি?"

"তোপসে।"

"বাঃ, তুমি ত আমাদের দুজনকেই চেনো দেখছি," বলল ফেলুদা।

"জটায়ু কোথায়?" জিগ্যেস করল মেয়েটি। বোঝা গেল সে এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে না দেখে কিছুটা হতাশ হয়েছে।

"তিনি ত আসেননি," বলল ফেলুদা। "তবে তাঁকে একদিন নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।"

"তোপসে এত মিথ্যে কথা বলে কেন?"

এই রে!—আমার সম্বন্ধে হঠাৎ এমন বদনাম কেন?

"মিথ্যে মানে?" ফেলুদা জিগ্যেস করল।

"একটা বইয়ে লিখেছে ফেলুদা ওর মাসতুতো ভাই, আরেকটায় লিখেছে জ্যাঠতুতো ভাই। মিথ্যেই ত!"

ফেলুদাই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। বলল, "ওহো—প্রথমে মাসতুতো ভাই লিখেছিল বটে, তখন ও গপ্পের মতো বানিয়ে বানিয়ে লিখতে চেষ্টা করছিল। আমি ধমক দিতে তারপর সত্যি কথাটা লিখতে শুরু করল। আসলে জ্যাঠতুতো ভাইটাই ঠিক।"

"আপনার সব অ্যাডভেঞ্চার ওর পড়া," বললেন অম্বুজ সেন।

"জেঠুকে খুঁজে বার করে দিতে পারবে তুমি?" ফেলুদার দিকে সটান তাকিয়ে প্রশ্ন করল রুনা।

"চেষ্টা করতে হবে।" বলল ফেলুদা। "তুমি যদি কোনো ক্লু জোগাড় করে দিতে পারো তাহলে ত কথাই নেই।"

"ক্লু?"

"ক্লু জানো ত?"

"জানি।"

"আছে তোমার কাছে কোনো ক্লু, যাতে আমরা চট করে বের করে দিতে পারি তোমার জেঠুকে?"

"ক্লু ত তুমি বার করবে। তুমি ত ডিটেকটিভ।"

"ঠিক বলেছ। খুব চালাক মেয়ে তুমি। কী নাম তোমার? একটা নাম ত জানি, অন্যটা কী?"

"ভাল নাম ঝর্না।"

ফেলুদা অম্বুজবাবুর দিকে ফিরল।

"দেখুন, আপনাদের দিক থেকে কতকগুলো ব্যাপারে সাহায্য না পেলে কিন্তু আমার পক্ষে এগোনো মুশকিল হবে।"

"কী সাহায্য বলুন।"

"প্রথমত, আপনাদের সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। আপনার দাদার সঙ্গে আমার মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপ। তাঁকে আমার আরেকটু ভাল করে চিনতে হবে। তাঁর কাজের ঘরটাও একবার দেখা দরকার। এমন কী, দরকার হলে তাঁর জিনিসপত্র একটু ঘেঁটে দেখতে হতে পারে। আশা করি আপত্তি হবে না।"

"মোটেই না," বললেন অম্বুজবাবু।

"আর আপনার দাদা যেখানে মর্নিং ওয়াকে যেতেন, সেই জায়গাটাও একবার দেখে আসা দরকার।"

"কোনোই অসুবিধে নেই। আমাদের ড্রাইভার বিলাসই আপনাদের গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে আনবে।"

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে পায়চারি আরম্ভ করেছে। তিনটে বড় বড় বুককেস বোঝাই বই, সেইদিকে তার দৃষ্টি।

"এসব বই কার?"
"সবই দাদার।"
"নানান বিষয়ে ইণ্টারেস্ট আছে দেখছি।"
"আজ্ঞে হ্যাঁ।"
"এমন কী গোয়েন্দাগিরি সম্বন্ধেও ত বই আছে।"
"হ্যাঁ। এক সময় ওটা নিয়েও পড়াশুনা করেছেন।"
"বিজ্ঞান, ইতিহাস, রান্নার বই, মুদ্রা সংগ্রহ, থিয়েটার..."
"থিয়েটারটা দাদার নেশা বলতে পারেন। আমাদের মাঠে পুজোর সময় স্টেজ বেঁধে নাটক হয়। দাদাই নির্দেশক; ফ্যামিলির সকলেই রংটং মেখে নেমে পড়ে। এমন কী ইনিও।" রুনার দিকে দেখিয়ে দিলেন অম্বুজবাবু। রুনা এখনও সেই-ভাবেই হাঁ করে চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে।
"এবারে অম্বরবাবুর কাজের ঘরটা একটু দেখতে পারি?"
"আসুন আমার সঙ্গে।"
অম্বুজবাবু উঠে পড়লেন সোফা থেকে।
বৈঠকখানার পাশে একটা প্যাসেজ, সেইটে পেরিয়ে পিছনের মাঠের দিকের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম আমরা।
পুব দিকের জানালা দিয়ে রোদ এসে ঘরটাকে আলো করে দিয়েছে। একটা বড় ডেস্ক, তার সামনে একটা রিভলভিং চেয়ার, উল্টোদিকে আরো দুটো চেয়ার। জানালার ধারে একটা আরাম-কেদারা। এছাড়া টেবিলের পিছন দিকে রয়েছে একটা শেলফ, একটা ক্যাবিনেট আর একটা গোদরেজের আলমারি। তার পাশের দেয়ালে একটা ফোলডিং ব্র্যাকেট থেকে হ্যাঙ্গারে ঝুলছে একটা ছাই রঙের কোট।
ডেস্কের উপরটা দেখলে মনে হয় অম্বরবাবু বেশ গোছানো লোক ছিলেন। কাগজপত্র টেলিফোন পেনহোলডার পিনকুশন পেপার-ওয়েট চিঠির র‍্যাক, সব পরিপাটি করে সাজানো। একটা ডেট-ক্যালেণ্ডার রয়েছে, তার তারিখটা তিনদিন আগের। ব্যাপারটা আমারও খটকা লেগেছিল, ফেলুদা সেটার দিকে অম্বুজ-বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ভদ্রলোক বললেন, "দাদাকে কয়েকদিন থেকেই অন্য-মনস্ক দেখছিলাম। সচরাচর দাদার এরকম ভুল হয় না কিন্তু।"
ফেলুদা খুঁতখুঁতে মানুষ, সে নিজেই শনিবারে দোসরাটা বদলে মঙ্গলবার পাঁচই করে দিল।
"দেরাজ খুলে দেখতে পারি কি?" ফেলুদা জিগ্যেস করল।
"দেখুন না।"
তিনটে দেরাজই পরপর খুলে তার ভিতরের জিনিসপত্র হাতড়ে দেখল ফেলুদা। ওপরের দেরাজ থেকে পাওয়া এক টুকরো কাগজ সম্বন্ধে মনে হল তার একটু কৌতূহল হয়েছে, কারণ সেটা সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে।
"হিমালয়ান অপটিক্যালস থেকে চশমা করাতেন বুঝি আপনার দাদা?"
"হ্যাঁ।"
"একটা ক্যাশমেমো দেখছি। তারিখটা সাতদিন আগের। নতুন চশমা করিয়ে-ছিলেন বুঝি?"
"কই, না ত!" বলে উঠল রুনা। সে-ও আমাদের পিছন পিছন এসেছে।
"তুমি কী করে জানলে, রুনা?" জিগ্যেস করল ফেলুদা।
"আমাকে ত দেখায়নি জেঠু!"



অম্বুজবাবু একটু হেসে বললেন, "দাদা যে কখন কী করছেন তার খবর আমরা সব সময়ে পেতাম না।"

আমরা অম্বরবাবুর স্টাডি থেকে বেরিয়ে এলাম।

"আপনাদের এক আত্মীয় এখানে থাকেন বোধ হয়," প্যাসেজে বেরিয়ে এসে বলল ফেলুদা, "আপনাদের এখানেই মানুষ হয়েছেন?"

"কে, সমরেশ? হ্যাঁ, থাকে বৈকি।"

ফেলুদার অনুরোধে সমরেশবাবুকে ডেকে পাঠানো হল। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, মুখে বসন্তের দাগ, চোখে পুরু চশমা। একটু যেন আড়ষ্টভাব নিয়ে ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন আমাদের থেকে হাত দশেক দূরে।

"বসুন," বলল ফেলুদা।

বেশ কিছুটা দূরে একটা চেয়ারে বসলেন সমরেশবাবু।

"আপনার পদবীটা কী?"

"মল্লিক।"

"কদ্দিন আছেন এ-বাড়িতে?"

"বছর পঁচিশ।"

"কী করেন?"

"একটা ফিল্ম ডিসট্রিবিউশন আপিসে কাজ করি।"

"কোথায়?"

"ধরমতলায়।"

"কী নাম কোম্পানির?"

"কোহিনুর পিকচার্স।"

"কদ্দিন আছেন ওখানে?"

"সাত বচ্ছর।"

"তার আগে কী করতেন?"

"এই...বাড়ির কাজকর্ম।"

হাত দুটোকে ভাঁজ করে হাঁটুর মধ্যে চেপে রেখেছেন ভদ্রলোক—যাকে বলে জবুথবু ভাব।

"আপনি অম্বরবাবুর অন্তর্ধানের ব্যাপারে কোনো আলোকপাত করতে পারেন?"

সমরেশবাবু চুপ। ফেলুদা বলল, "তিনি একটা হুমকি-চিঠি পেয়েছিলেন জানেন?"

"জানি।"

"আপনার ঘর কি এ-বাড়ির একতলাতে?"

"হ্যাঁ।"

"অম্বরবাবুর কাছে বাইরের লোকজন দেখা করতে আসত?"

"তা আসত, মাঝে-মাঝে।"

"সম্প্রতি এমন কোনো লোককে আসতে দেখেছেন, যাকে আগে দেখেননি?"

"সেটা লক্ষ করিনি। তবে--"

"তবে কী?"

"এই পাড়ায় কিছু ছেলেকে দেখেছি, যাদের আগে দেখিনি।"

"কোথায়?"

"মোড়ের মাথায়।"
"কী করত তারা?"
"মনে হত এই বাড়ির দিকে চোখ রাখছে।"
"বয়স কীরকম তাদের?"
"বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বলে মনে হয়।"
"কজন ছেলে?"
"চারজন।"

ফেলুদা একটুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "ঠিক আছে। আপনি আসতে পারেন।"

এইসব কথা থেকে ফেলুদা কোনো ক্লু পেল কিনা জানি না। যেটাতে মনে হয় সত্যি করে কাজ হল, সেটা হল অম্বুজবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তায়।

রীতিমতো সুন্দরী মহিলা, তার উপর যাকে বলে "ব্রাইট"। বয়স চল্লিশের উপর হলেও দেখে বোঝার জো নেই। দোতলার একটা ছোট বৈঠকখানায় বসে কথা হল।

ফেলুদা প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিল ভদ্রমহিলাকে বিরত করার জন্য। "তাতে কী হয়েছে," বললেন মিসেস অম্বুজ সেন, "গোয়েন্দাকে যে এভাবে জেরা করতে হয় সে ত ফেলুদার গল্প পড়েই জেনেছি। খুব ভাল লাগে পড়তে গোয়েন্দা কাহিনী।"

"তাহলে ত ভালই হল," বলল ফেলুদা। "আমার প্রধান মুশকিলটা কোথায় হচ্ছে বলি। অম্বরবাবু একটা হুমকি-চিঠি পেয়েছিলেন জানেন বোধহয়।"
"তা জানি বৈকি।"
"দেখেছেন সে চিঠি?"
"তাও দেখেছি।"

"আমি অম্বরবাবুকে জিগ্যেস করেছিলাম তাঁর জীবনে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি না যার ফলে অন্য কোনো মানুষের সর্বনাশ হতে পারে। উনি বলেছিলেন তেমন কোনো ঘটনা তাঁর জানা নেই। অবিশ্যি আমার বলা উচিত ছিল যে, রিসেন্ট ঘটনা হবার দরকার নেই, অতীতের ঘটনা হলেও চলবে, কেননা প্রতিহিংসার ভাবটা মানুষ অনেক সময় অনেক দিন পুষে রাখে। আমি এখন আপনাকে জিগ্যেস করতে চাই, আপনি কি এমন কোনো ঘটনার কথা জানেন? দশ-বিশ বছর আগের হলেও চলবে।"

ভদ্রমহিলা একটুক্ষণ চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে বললেন, "তাহলে আপনাকে বলি। আপনি দেখুন এমনি ঘটনার কথাই বলছেন কিনা। এটা আমার কাল রাত্তিরে হঠাৎ মনে পড়ে। আমার স্বামীকেও এখনো বলিনি।"
"কী ঘটনা বলুন ত।"
"একটা অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপার।"
"অ্যাক্সিডেন্ট?"

"অনেকদিন আগে। তখনও রুনা হয়নি; বোধহয় তার পরের বছরই হল। আমার ভাসুর তখন নিজেই গাড়ি চালাতেন। আমার শ্বশুরের গাড়ি। অস্টিন। উনি শ্যামবাজারের দিকে একজন লোককে চাপা দেন। সে-লোক মারা যায়।"

আমরা দুজনেই চুপ। ঘরে থমথমে ভাব। অম্বুজবাবু পাশেই ছিলেন, চাপা গলায় বললেন, "আশ্চর্য, এটা আমার মনেই ছিল না।"

"আর কী মনে পড়ছে?" ফেলুদা দুজনকেই প্রশ্নটা করল।

"নিম্ন-মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি," বললেন অম্বুজবাবু, "ক্লার্ক ছিলেন ভদ্রলোক।"

"নাম মনে পড়ছে?"

"উঁহু।"

"স্ত্রী ছিল, আর তিনটি ছেলেমেয়ে," বললেন মিসেস সেন। "ছেলেটির বয়স তেরো-চোদ্দ। মেয়ে দুটি আরো ছোট। পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন বিধবার হাতে।"

"কে, অম্বরবাবু?"

"হ্যাঁ।"

"সেই থেকেই দাদা ড্রাইভিং বন্ধ করে দেন," বললেন অম্বুজবাবু। "এখন মনে পড়ছে।"

"হুঁ..." ফেলুদা গম্ভীর। "তার মানে এখন সে-ছেলের বয়স বছর পঁচিশ। পরিবারটির যে সর্বনাশ হবে এই ঘটনার ফলে, এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পাঁচ হাজার টাকা আর কদ্দিন চলে?"

"এর বেশি আর কিছু মনে পড়ছে না, জানেন," বললেন মিসেস সেন।

"আমারও না," বললেন অম্বুজবাবু।

"অম্বরবাবু কি ডায়রি রাখতেন?" ফেলুদা জিগ্যেস করল।

"কই, সেরকম ত শুনিনি এখনও," বললেন অম্বুজবাবু।

ফেলুদা উঠে পড়ল।

"অনেক ধন্যবাদ, মিসেস সেন। আপনি অন্ধকারে একটা আলো দেখিয়েছেন আমাদের, তার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।"

"আমরা কিন্তু মনেপ্রাণে চাইছি যে, আপনি ব্যাপারটার একটা সুরাহা করেন।"

কথাটা যে ভদ্রমহিলা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

॥ ৩ ॥

অম্বরবাবুর অসুস্থ মাকে বিরক্ত করার কোনো মানে হয় না, তাই আমরা আপাতত পাম এভিনিউ-এর পাট শেষ করে সেনেদের অ্যামবাসাডরে চলে গেলাম গঙ্গার ধারে। গে রেস্টোরান্টের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার বিলাসবাবু বললেন, "এইখান থেকে স্যার হাঁটতে আরম্ভ করে সোজা দক্ষিণ দিকে গিয়ে ঠিক এক ঘণ্টা বাদে আবার ফিরে আসতেন। একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়।"

"আপনি গাড়িতেই বসে থাকতেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কদ্দিন ড্রাইভারি করছেন সেন-বাড়িতে?"

"নাইন ইয়ারস।"

"তার মানে অ্যাক্সিডেণ্টের ব্যাপারটা আপনি জানেন না?"

"অ্যাক্সিডেণ্ট?"

"অম্বরবাবু বছর বারো আগে একবার একটি লোককে গাড়ি চাপা দিয়ে

মারেন।"

"সেন সাহেব?"

"কেন, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"উনি যে কোনোদিন নিজে ড্রাইভ করেছেন সেইটেই জানতুম না।"

"ওই ঘটনার পরেই ড্রাইভিং ছেড়ে দেন।"

"তা হবে। ড্রাইভারের ত দোষ দেওয়া যায় না সব সময়! রাস্তার লোকে যেভাবে চলাফেরা করে, আরো বেশি লোক মরে না কেন সেইটেই ত ভাবি। ড্রাইভারের আর কী দোষ?"

"অম্বরবাবু যেদিন আর ফিরলেন না, সেদিনের ঘটনাটা একটু বলবেন?"

"সেদিন উনি আসছেন না দেখে আমি হেস্টিংস পর্যন্ত গিয়ে তল্লাস করেছিলাম। পথে লোক ধরে ধরে জিগ্যেস পর্যন্ত করিছি। গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে রাস্তায় নেমে খুঁজেছি যদি কোথাও পড়ে-টড়ে গিয়ে থাকেন। হার্টটা তেমন মজবুত ছিল না ত।"

"লোকজন কেমন ছিল রাস্তায়?"

"সকালে এদিকটা লোক মন্দ থাকে না। সব হাঁটতে আসে। তবে নিউ হাওড়া ব্রিজের সাইডটায় লোক থাকে না বললেই চলে। স্যার ত ওদিকেই যেতেন। ফস্ করে যদি গাড়িতে কটা জোয়ান লোক এসে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে যায়, কেউ টেরও পাবে না।"

আমরা গাড়িতে করেই দশ মাইল স্পিডে চালিয়ে হেস্টিংস পর্যন্ত ঘুরে এলাম, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেলাম না।

এরপর দুদিন পাম এভিনিউ থেকে কোনো খবর নেই। বিষ্যুদবার বিকেলে লালমোহনবাবু এসেই বললেন, "ঘটনা এগলো?" অম্বর সেন উধাও শুনে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, "আপনার একটি কেসও গেঁজে যেতে দেখলুম না। ধন্যি আপনার লাক্!"

"আপনার গ্রেট স্কলার প্রতিবেশী মৃত্যুঞ্জয় সোমের কী খবর?"

"দূর দূর! স্কলার না মুণ্ডু!"

"সে কী মশাই, এর মধ্যে আবার কী হল? সেদিন ত সুপারলেটিভ ছাড়া কথাই বলছিলেন না।"

"আর বলবেন না মশাই।"

"কেন, কী হল?"

"বলতেও লজ্জা করে।"

"আমার কাছে আবার লজ্জা কী? বলে ফেলুন।"

ব্যাপারটা কী জানি না, কিন্তু সেটা যে লালমোহনবাবু চেপে যেতে চাইছেন সেটা বুঝতেই পারছি। এদিকে ফেলুদাও ছাড়বার পাত্র নয়। শেষটায় পীড়াপীড়িতে ভদ্রলোক বলেই ফেললেন।

"আরে মশাই, ভাবতে পারেন, ভদ্রলোক প্রদোষ মিত্তিরের নাম শোনেননি! আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিতে গিয়ে একেবারে ভেড়া বনে গেলুম! বলে কিনা—হু ইজ প্রদোষ মিত্র?"

"তাতে আর কী হল, এত বড় স্কলার, হার্বার্টের ডবল এম. এ., আমিও ত তাঁর নাম শুনিনি।"

কথাটা বোধহয় লালমোহনবাবুকে কিছুটা আশ্বস্ত করল। বললেন, "তা যা বলেছেন। এত বড় দুনিয়ায় কটা মানুষকে আর কটা মানুষ চেনে! আর ভদ্রলোক বোধহয় বেশির ভাগ সময় বিদেশে কাটিয়েছেন। কাজেই এক্সকিউজ করে দেওয়া যায়—কী বলেন?"

আমাদের কথার মাঝখানেই পাম এভিনিউ থেকে ফোন এল। অম্বুজ সেন। একটা বেনামী চিঠি এসেছে ভদ্রলোকের নামে। টেলিফোনে সেটা পড়ে শোনালেন ভদ্রলোক।

'আগামীকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ১০০ টাকার নোটে ২০০০০ টাকা ব্যাগে পুরে প্রিনসেপঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের থামের ধারে রেখে যাবেন। অম্বর সেনকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাবার এই একমাত্র উপায়। পুলিশ বা গোয়েন্দার সাহায্য নিলে ফল হবে মারাত্মক।'

ফেলুদা ফোনে বলল, "এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেবার দরকার নেই, মিঃ সেন। আরো চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে। এর মধ্যে আমার কয়েকটা কাজ আছে। আপনাদের দিক থেকে কী করণীয় সেটা আমি কাল দুপুর দুটোর মধ্যে আপনাদের বাড়ি গিয়ে বলে আসব। তবে হ্যাঁ, টাকার ব্যবস্থাটা করে রাখবেন। ওটা খুবই জরুরী।"

"কিন্তু গোয়েন্দার ব্যাপারে শাসিয়ে রেখেছে যে মশাই," ফেলুদা ফোন রাখার পর লালমোহনবাবু বললেন।

ফেলুদা উত্তরে শুধু বলল, "জানি।"

রকেটের বেগে ঘটনা এগিয়ে চলেছে। এই টাকাটা না দিয়ে উপায় কী আছে সেটা আমিও ভেবে পেলাম না।

"লালমোহনবাবু, কাল আপনার গাড়িটা একটু পাওয়া যাবে কি?" প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করে থেকে অবশেষে প্রশ্ন করল ফেলুদা।

"এনি টাইম," বললেন জটায়ু। "কখন চাই বলুন।"

"সকালে একবার বেরোব। সাড়ে ন'টা নাগাদ পেলেই চলবে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমার কাজ হয়ে যাবে। তারপর বিকেল পাঁচটা নাগাদ আপনি যদি গাড়িটা নিয়ে চলে আসেন ত খুব ভাল হয়।"

"ভেরি গুড।"

এরপর ফেলুদা আর কোনো কথাই বলল না।

পরদিন লালমোহনবাবুর গাড়িতে করে ফেলুদা বেরোল। একাই বেরোল, কাজেই কোথায় গেল কী করল জানার উপায় নেই। বারোটা নাগাদ ফিরে আসার পর দেখলাম তার মুখের ভাব বদলে গেছে।

"কী ঠিক করল ফেলুদা?" ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম।

"টাকাটা দিতেই হবে," বলল ফেলুদা। "তবে গোয়েন্দা সম্পর্কে হুমকিটা মানা চলবে না।"

"মানে? তুমি নিজেও থাকবে সেখানে?"

"ফেলু মিত্তির অত সহজে ঘাবড়াবার লোক নয় রে তোপসে।"

"আর আমরা? আমরা কোথায় থাকব?"

"তোরাও থাকবি কাছাকাছির মধ্যে, কারণ হেল্‌প দরকার হতে পারে।"

আমি ত শুনে থ।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে আমরা গেলাম পাম এভিনিউ।

অম্বুজবাবু স্বভাবতই বাড়িতে ছিলেন, ফেলুদাকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

"কাল রাত্তিরে চোখের পাতা এক করতে পারিনি মশাই। দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল!"

ফেলুদা গম্ভীরভাবে বলল, "টাকাটা আপনাদের খসবেই, মিঃ সেন। অম্বরবাবুকে ফিরে পাবার আর কোনো রাস্তা নেই।"

"তুমি ধরতে পারোনি এখনো?" রুনা হঠাৎ ঘরের দরজা থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করে উঠল।

"অনেকটা ধরে ফেলেছি, রুনা," বলল ফেলুদা। "খুব চেষ্টা করছি যাতে বাকিটা আজ বিকেলের মধ্যেই ধরতে পারি।"

"ব্যাস, ঠিক আছে।"

রুনাকে ভীষণ নিশ্চিন্ত বলে মনে হল। ফেলুদা ব্যর্থ হবে এটা যেন তার কাছে ভয়ানক একটা দুঃখের ব্যাপার।

"তাহলে কী করা উচিত বলে মনে হয়?" জিগ্যেস করলেন অম্বুজবাবু।

"টাকার ব্যবস্থা হয়েছে?"

"সেটা করে ফেলেছি। বাড়িতে ত অত ক্যাশ থাকে না, তাই আজ সকালেই সমবেশকে দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে নিয়েছি।"

"সেই টাকা, এবং যে ব্যাগে করে সেটা দেওয়া হবে—এই দুটো জিনিস আমি একবার দেখতে চাই।"

টাকা এবং ব্যাগ এসে গেল। এত টাকা এর আগে একসঙ্গে দেখেছি কি? মনে ত পড়ে না।

ফেলুদার সামনেই কুড়িটা করে একশো টাকার নোট রাবার ব্যান্ড দিয়ে গোছ করে দশ ভাগে ব্যাগের মধ্যে পুরে দেওয়া হল। তার ফলে ব্যাগের চেহারা হয়ে গেল কচ্ছপের পিঠের মতো।

"ভেরি গুড," বলল ফেলুদা। "তাহলে আমরা বেরিয়ে পড়ছি পৌনে ছ'টা নাগাদ।"

অম্বুজবাবু চমকে উঠলেন।

"সে কী, আপনি যাবেন?"

"অপরাধীকে ধরার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে, মিঃ সেন। আপনি টাকা রেখে আসবেন, আর সে লোক দিব্যি এসে সেটা তুলে নিয়ে যাবে, এ ত হতে দেওয়া যায় না! অম্বরবাবুকে ফেরত পাওয়াটাই বড় কথা সেটা জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে এই গুন্ডাদেরও সাজা হওয়া উচিত নয় কি? নাহলে ত তারা এই ধরনের কুকীর্তি করেই চলবে। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। সাবধানতা অবলম্বন না করে আমি কখনো কিছু করি না।"

"তাহলে—"

"আমি বলছি, আপনি মন দিয়ে শুনুন। আপনি আপনার গাড়িতে করে যাবেন টাকা নিয়ে। নিউ হাওড়া ব্রিজের দিকটা দিয়ে আসবেন। ওদিকটা মোটামুটি নিরিবিলি। গাড়ি প্রিনসেপঘাট থেকে অন্তত দুশো গজ আগে দাঁড় করিয়ে আপনার ড্রাইভারকে বলবেন টাকাটা যথাস্থানে রেখে আসতে। আমি কাছাকাছির মধ্যেই থাকব। কাজটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেটা আমি দেখতে



পাব। আমরা মীট করব ঘটনার পর। গে রেস্টোরান্টের সামনে। আপনি টাকা রেখে সোজা ওখানে চলে আসবেন। আমিও তাই করব। অপরাধীকে যদি ধরতে পারি তাহলে তিনিও আমার সঙ্গেই থাকবেন, বলাই বাহুল্য।"

অম্বুজবাবুকে মনে হল যেন তিনি বেশ নার্ভাস বোধ করছেন। সেটা অস্বাভাবিক নয়। টাকার অংকটা ত কম নয়। আর গুন্ডারা কী করবে না-করবে কে জানে?

বিকেল সাড়ে চারটার সময় লালমোহনবাবু এলে পর ফেলুদার প্রথম কথা হল, "মশাই, এমন অভিনব কেস আর আমি কোনোদিন পাইনি।"

অবিশ্যি আমাকে জিগ্যেস করলে পরে আমি এখনো বলতে পারব না এর বিশেষত্বটা কোথায়।

"তাহলে আমরা কী করছি?" জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

"শুনে নিন মন দিয়ে," বলল ফেলুদা। "তুইও শোন, তোপসে। সাড়ে পাঁচটার সময় আপনার গাড়ি নিয়ে আপনি আর তোপসে চলে যাচ্ছেন গে রেস্টোরান্টে। সেখানে আপনাদের অভিরুচি অনুযায়ী পানাহার সেরে ঠিক সোয়া ছ'টায় রেস্টোরান্ট থেকে বেরিয়ে সটান চলে যাবেন দক্ষিণে প্রিনসেপঘাট লক্ষ করে। গাড়ি রেখে যাবেন রেস্টোরান্টের সামনে। থামওয়ালা ঘাটটার কাছে পৌঁছানোর কিছু আগেই দেখবেন ডানদিকে একটা গম্বুজওয়ালা বসার ঘর রয়েছে। দুজনে সেখানে ঢুকে বেঞ্চিতে বসে পড়বেন। ভাবটা এমন হওয়া চাই যেন সান্ধ্যভ্রমণ আর বায়ুসেবন ছাড়া আপনাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। ঘাটের দিকে আড়দৃষ্টি রাখবেন, তবে যেন মনে না হয় যে, ওটাই আপনাদের লক্ষ্য। তারপর সাড়ে ছ'টার দশ মিনিট পর ওখান থেকে উঠে পড়ে নিজের গাড়িতে ফিরে আসবেন। আমিও সেখানেই আপনাদের মীট করব।"

॥ ৪ ॥

ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হতে চলল, কিন্তু এখনও দিব্যি ঠান্ডা। তবে শীতকালের মতো দিন আর অত ছোট নেই, ছ'টা পর্যন্ত বেশ আলো থাকে। আমি আর লালমোহনবাবু কফি আর মুরগির কাটলেট খেয়ে ঠিক সোয়া ছটায় রেস্টোরান্ট থেকে বেরিয়ে রওনা দিলাম প্রিনসেপঘাটের দিকে।

পথে লালমোহনবাবু মাঝে-মাঝে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আঃ উঃ শব্দ করে সান্ধ্যভ্রমণের অভিনয় করছেন, সেটা যে খুব কনভিনসিং হচ্ছে তা নয়। কিন্তু ক্রমেই আশপাশের লোকজন এত কমে আসছে, ফুচকাওয়ালা আর ভেলপুরিওয়ালার দল এত পিছিয়ে পড়ছে যে, এখন উনি যা খুশি করলেও আপত্তির কিছু নেই।

দশ মিনিট লাগল আমাদের গম্বুজওয়ালা বসার জায়গাটায় পৌঁছাতে। বেঞ্চি দখল করার পর এদিক ওদিক চেয়ে লালমোহনবাবু চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন, "তোমার দাদাকে দেখতে পাচ্ছ কি, তপেশ?"

দাদা কেন, কোনো মানুষকেই দেখতে পাচ্ছি না ঘাটের নৌকোর মাঝিদের ছাড়া। কোনখানে লুকিয়ে রয়েছে ফেলুদা কে জানে। ঘাটের দেড়শো বছরের

পুরোন থামগুলো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যের ফাঁকগুলো ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে। ওখানে গিয়ে কেউ টাকার ব্যাগ রাখলে, বা সে ব্যাগ নিতে এলে, কেউ দেখতেও পাবে না।

"ওই যে!" লালমোহনবাবু আমার হাত খামচে ধরেছেন।

হ্যাঁ--ঠিকই দেখেছেন ভদ্রলোক।

একজন সাদা প্যান্ট আর কালো কোট পরা লোক হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে প্রিন্সেপঘাটের দিকে। অম্বরবাবুদের ড্রাইভার। বিলাসবাবু।

বিলাসবাবু এবার থামগুলোর ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

মিনিটখানেক পরেই তাঁকে আবার দেখা গেল। এবার হাত খালি। বড়-রাস্তায় পড়ে ডাইনে মোড় ঘুরে গাছের আড়াল হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। আলো আরো পড়ে এসেছে। এখন সামনের সারির থামগুলো ছাড়া আর কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না। একবার মনে হল অন্ধকারের মধ্যে কে যেন নড়ল; কিন্তু সেটা চোখের ভুল হতে পারে।

এবার দেখলাম সেনদের গাড়ি আমাদের সামনে দিয়ে রেস্টোরান্টের দিকে চলে গেল। তারপর তিনজন জীন্‌স পরা ছেলে, আর তাদের পিছনে ঢোলা প্যান্টপরা হাতে লাঠিওয়ালা এক বৃদ্ধ ফিরিঙ্গিও সেই দিকেই চলে গেল।

আমরাও উঠে পড়লাম।

আবার ঠিক দশ মিনিটই লাগল আমাদের গাড়িতে পৌঁছাতে।

কিন্তু ফেলুদা কই?

এবার গাড়ির ভিতরে চোখ গেল।

নস্যিরঙের আলোয়ান জড়ানো এবং লুঙ্গি পরা এক বুড়ো বসে আছে ড্রাইভার হরিপদবাবুর পাশে। থুতনিতে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, কিন্তু গোঁফ নেই।

"স্যালাম কর্তা!" লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বলল লোকটা।

এ আর বলতে হবে না। ওই মুসলমান মাঝি ফেলুদা ছাড়া আর কেউ না। এদিকে অম্বুজবাবুও এসে পড়েছেন রাস্তার ওদিক থেকে। তাঁর কাছে ফেলুদার নিজের পরিচয় দিতেই হল। "নৌকো থেকে ঘাটটা সবচেয়ে ভাল দেখা যায়, তাই ওখানেই ওত পাতার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।"

"কিন্ত কী হল সেইটে বলুন, মিঃ মিত্তির।"

ফেলুদা গম্ভীর।

"ভেরি সরি, মিঃ সেন।"

"মানে?"

"আমি ঘাটে ওঠার আগেই সে লোক টাকা নিয়ে হাওয়া।"

"বলেন কী! টাকা নেই? লোকটাকেও ধরা গেল না?"

"বলছি ত—আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

অম্বুজবাবু কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ফেলুদার দিকে। কথাটা যেন ভদ্রলোকের বিশ্বাসই হচ্ছে না। সত্যি বলতে কী, আমারও কেমন যেন মাথা ঝিমঝিম করছিল। ফেলুদাকে এভাবে হার মানতে এর আগে দেখিনি কখনো।

"আপনাদের পুলিশের সাহায্যই নিতে হবে, মিঃ সেন," বলল ফেলুদা। "আপনি বাড়ি চলে যান। এবার ত অম্বরবাবুর ফিরে আসা উচিত। আমরা

একবার বাড়িতে ঢুঁ মেরে আপনার ওখানেই আসছি। এই বেশে ত আর পাম এভিনিউ-এর বৈঠকখানায় ঢোকা যাবে না।"

বাড়ি যাওয়ার একমাত্র কারণ ফেলুদার একটু ফিটফাট হয়ে নেওয়া। তাছাড়া হাতেও কালো রং লেগেছিল—জিগ্যেস করতে বলল আলকাতরা—সেটাও ধুয়ে নেওয়া দরকার। আলকাতরাটাও মেক-আপের অংশ কিনা জিগ্যেস করাতে কোনো উত্তর দিল না ফেলুদা।

আমরা যখন পাম এভিনিউ রওনা হলাম, তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। পথে লালমোহনবাবু একবার বলেছিলেন, "আপনার অমন ব্রিলিয়ান্ট মেক আপটা মাঠে মারা যাবে ভাবিনি মশাই—" কিন্তু তাতে ফেলুদা কোনো মন্তব্য করেনি।

পাম এভিনিউ পেঁছানর সঙ্গে-সঙ্গেই রুনার গলায় উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল, "জেঠু এসে গেছে!"

অম্বরবাবু ফিরেছেন আমরা আসার মিনিট দশেক আগে। আমরা বৈঠক-খানায় গিয়ে ঢুকতেই ভদ্রলোক সোফা ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে ফেলুদার হাত দুটো ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন। ভাই, ভাইয়ের বৌ, ভাইঝি, সমরেশবাবু, বিলাসবাবু, সকলেই ঘরে রয়েছেন।

"কোথায় আটক করে রেখেছিল আপনাকে?" একগাল হেসে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

"ওঃ—সে আর বলবেন না—"

ফেলুদা হাত তুলে বাধা দিল ভদ্রলোককে।

"উনি ত বলবেনই না, আর আপনিও বলবেন না, মিঃ সেন। কারণ বললেই একরাশ কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। মিথ্যে শব্দটা ব্যবহার করলাম না, কারণ সেটা ভাল শোনায় না।"

"হুররে হুররে হুররে!" চেঁচিয়ে উঠল রুনা। "ফেলুদা ধরে ফেলেছে, ফেলুদা ধরে ফেলেছে!"

এবার ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়ে বলল, "আপনারা যে একটা বিরাট ফন্দি এঁটেছিলেন সেটা ধরে ফেলেছি, কিন্তু সেটার কারণটা এখনো ঠিক ধরতে পারছি না।"

"কারণ বলছি মিঃ মিত্তির," হেসে বললেন অম্বর সেন। "কারণ আমার ওই খুদে ভাইঝিটি। সে আপনাকে বলতে গেলে একরকম পুজোই করে। তার ধারণা আপনি ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে। তাই ওকে আমি সেদিন বললাম যে, তোর ফেলুদাকে আমি জব্দ করতে পারি। ব্যস্—ওই একটি উক্তি থেকেই সমস্ত ফন্দিটির উৎপত্তি। এতে আমাদের সকলেরই ভূমিকা আছে!"

"অর্থাৎ এও আপনাদের একটা ফ্যামিলি নাটক?"

"ঠিক তাই। সবাইকে সব কিছু আমিই শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিলাম। আপনি কী জিগ্যেস করলে কী উত্তর দেবে, সব লিখে মুখস্থ করিয়ে দিয়ে-ছিলাম—এমন কী ড্রাইভার ও চাকরকে পর্যন্ত। প্রধান নারীচরিত্র অবশ্য বৌমা, যাঁকে দিয়ে মনগড়া অ্যাকসিডেণ্টের কথাটা বলানো হয়েছিল। আমি নিজে ভাবিনি যে, আপনি ব্যাপারটা ধরে ফেলবেন—ইন ফ্যাক্ট, এই নিয়ে আমার ভাইয়ের সঙ্গে একশো টাকা বাজিও ধরেছিলাম। এ ব্যাপারে রুনার উৎকণ্ঠাই ছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ তার হিরো যদি ফেল করত, তাহলে তার দুঃখের সীমা থাকত না।

এই ঝুঁকিটা অবশ্য আমাকে নিতেই হয়েছিল, কিন্তু এখন সে নিশ্চিন্ত। এবার বলুন ত আপনার সিসটেমটা কী। কিসে আপনার প্রথম সন্দেহ হল মিঃ মিত্তির?"

ফেলুদা বলল, "প্রথমত এবং প্রধানত, দুটো ক্লু, দুটোই আপনার কাজের ঘরে পাওয়া। এক হল হিমালয়ান অপটিক্যালসের ক্যাশ মেমো। আমি সেখানে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, আপনি দিন সাতেক আগে একটি সোনালি ফ্রেমের নতুন চশমা করিয়েছেন। অথচ আপনার বাড়িতে সেটা সম্বন্ধে কেউ জানে না, বা কেউ সেটা আপনাকে পরতে দেখেনি। প্রশ্ন হল, এই চশমার দরকার পড়ছে কেন। এবং ঠিক এই সময় দরকার কেন।

"দুই হল--আপনাদের ডেট ক্যালেন্ডারে তিন দিনের পুরোন তারিখ। আপনার চাকর যখন তারিখ বদল করে না, তখন সেটা নিশ্চয় আপনিই করেন। তাহলে বদল হয়নি কেন?

"তখনই মনে হল যে, আপনাকে যদি কিডন্যাপ্ড হবার ভান করে গা ঢাকা দিতে হয়, তাহলে হয়তো একটা ডেরা স্থির করে দুদিন আগে গিয়েই সেখানে থাকা অভ্যাস করতে হবে। নতুন জায়গায় ধাতস্থ হতে সময় লাগে বৈকি! আর তাই যদি হয়, তাহলে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য আপনাকে হয়তো একটি ছদ্মবেশ ও একটি নতুন নাম নিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে একটি নতুন চশমা নেওয়াও মোটেই অস্বাভাবিক নয়।"

"ধরে ফেলেছে, ফেলুদা সব ধরে ফেলেছে!" আবার চেঁচিয়ে উঠল রুনা।

এর মধ্যে লালমোহনবাবু যে হঠাৎ কেন খাঁচায়-বন্ধ সিংহের মতো পায়চারি করতে আরম্ভ করেছেন তা বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক যাতে কোনো বাড়াবাড়ি না করে ফেলেন তাই ওঁকে সামলাতে যাব, এমন সময় উনি হঠাৎ দুহাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন—

"ইউরেকা!"

"চিনেছেন ভদ্রলোককে?" ফেলুদা প্রশ্ন করল।

"চিনব না? মৃত্যুঞ্জয় সোম!"

অম্বরবাবু হোহো করে হেসে উঠলেন।

"আপনার সংগে সেদিন পার্কে দেখা হওয়াটা সম্পূর্ণ অ্যাকসিডেন্ট, মশাই। আসলে গড়পারেই আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ছিলাম সাতদিন। আপনি যখন এগিয়ে এসে জটায়ু-টটায়ু বলে নিজের পরিচয় দিলেন, তখন ভাবলাম—বা রে, এ তো বেশ মজা! যাকে জব্দ করতে যাচ্ছি তারই সাকরেদের সংগে দেখা হয়ে গেল! তাহলে এঁকে নিয়ে একটু রগড় করতে পারলে কেমন হয়? তারপর অবিশ্যি মিত্তির মশাইয়ের বাড়িতেও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার আসল চেহারায়, কিন্তু আপনি চিনতে পারেননি।"

"কিন্তু তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?" বলল ফেলুদা, "নাটকের ত এখানেই শেষ নয়, অম্বরবাবু। এখনো ত ড্রপসিন ফেলা চলবে না।"

ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে বদলে গেল, কারণ ফেলুদা কথাটা বলেছে গম্ভীর থমথমে ভাবে।

"হোয়্যার ইজ দ্য মানি?" প্রশ্ন করল ফেলুদা।

অম্বর সেন ফেলুদার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "মিঃ মিত্তির, আপনি আমাকেও কিন্তু একজন শখের গোয়েন্দা বলতে পারেন। আমি যদি

বলি যে, টাকাটা আপনিই নিয়ে আমাদের সঙ্গে একটু রগড় করছেন, তাহলে কি খুব ভুল বলা হবে? অপরাধী যখন নেই, কিডন্যাপার নেই, তখন টাকাটা সরে কোথায় যাবে মিঃ মিত্তির?"

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, "মিঃ সেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আপনার শখের গোয়েন্দাগিরি এক্ষেত্রে খাটল না। প্রিনসেপঘাটের কাছে আজ সন্ধ্যায় আমি ছাড়াও আরেকজন ছদ্মবেশী ছিলেন।"

"বলেন কী!" বললেন অম্বর সেন, "আপনি তাকে দেখেছেন?"

"দেখেছি, কিন্তু চিনিনি।"

"কিন্তু আপনি তখনই তাকে ধরলেন না কেন?"

"তখন ধরাটা আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট নাটকীয় হত না। আপনারা নাটক পছন্দ করেন ত? আমার মনে হয় আপনাদের সামনে ধরাটা আরো নাটকীয় হবে। আমার সন্দেহ তিনি এখানেই আছেন। এ সন্দেহ ঠিক কি না সেটা আমি একবার পরখ করে দেখতে চাই।"

ঘরে যাকে বলে পিন-পড়া নিস্তব্ধতা। রুনার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম সেও ফ্যাকাসে মেরে গেছে।

"বিলাসবাবু, আপনার জুতোর তলাটা একবার দেখুন ত," বলে উঠল ফেলুদা।

বিলাসবাবু ঘরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন, "দেখব আর কী স্যার, জুতোর তলায় ত আলকাতরা লেগে রয়েছে। ব্যাগ রেখে ফেরবার সময় ত রাস্তায় পা আটকে যাচ্ছিল।"

"ওই আলকাতরা আমিই ছড়িয়ে রেখেছিলাম থামটার চারপাশে," বলল ফেলুদা, "কারণ একজনের সম্বন্ধে আমার মনে একটা সন্দেহের কারণ ঘটেছিল। আপনারা সকলেই বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেছিলেন। কিন্তু ইনি যে মিথ্যেটা বলেছিলেন সেটা একটু অন্যরকম। ইনি বলেছিলেন...ও কী, আপনি যাচ্ছেন কোথায়?"

কিন্তু পালাবার পথ নেই। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন বিলাসবাবু। এক ঝটকায় যাকে বগলদাবা করে ফেলেছেন ভদ্রলোক, তিনি হচ্ছেন সমরেশ মল্লিক।

"এবার আপনার স্যান্ডেলের তলাটা এঁদের দেখিয়ে দিন ত," বলল ফেলুদা। "বিলাসবাবু একটু হেল্প করলে ব্যাপারটা সহজে হয়ে যায়।"

বিলাসবাবু নিচু হয়ে সমরেশবাবুর পা থেকে স্যান্ডেলটা একটানে খুলে নিয়ে তার তলাটা সকলকে দেখিয়ে দিলেন। উনিই যে গিয়েছিলেন প্রিনসেপঘাটের থামের পাশে, তাতে আর কোনো সন্দেহ রইল না।

"আপনার কোহিনুর কোম্পানি ত দু'বছর হল লাটে উঠেছে সমরেশবাবু," বলল ফেলুদা, "তা সত্ত্বেও আপনি সেখানে চাকরি করছিলেন কী করে সেটা এঁদের একটু বুঝিয়ে বলবেন? আর যদি চাকরি না-ই করে থাকেন, তবে এই দু' বছর কীভাবে রোজগার করেছেন সেটা বলবেন?"

সমরেশবাবু নিরুত্তর। বিলাসবাবু এখনো তাঁকে জাপটে ধরে আছেন; মনে হয় পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত সেইভাবেই ধরে থাকবেন।

"অবিশ্যি এই ব্যক্তির খোলস খুলে ফেলার জন্য আপনাদের আমাকেই ধন্যবাদ দিতে হবে," বলল ফেলুদা। "আপনারা ত আর বিশ হাজার টাকা রাখতেন না

থামের পাশে! নেহাত আমি যখন বললাম শাসানি কেয়ার করি না, আমি নিজে থাকব সেখানে, তখন আপনাদের বাধ্য হয়েই রাখতে হল, আর সেই টাকা হাত করার সুযোগ নিলেন সমরেশবাবু। যাক্‌গে, এখন ত জানলেন টাকা কোথায় আছে। এবার সেটা আদায় করার রাস্তা আপনারা দেখুন। উনি যদি সে-টাকা অন্যত্র পাচার করে থাকেন, তাহলে পুলিশ ত আছেই; তারা এসব আদায়ের অনেক রাস্তা জানে। আমার কাজ এখানেই শেষ।"

ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনও উঠে পড়েছিলাম, কিন্তু ওঠা আর হল না। মিসেস সেন বাধা দিলেন।

"শেষ বলছেন কী? এত সহজে শেষ হবে কী করে? আপনাকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথাগুলো বললাম, তার বুঝি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না? আজ রাত্তিরে আপনাদের খেতে হবে আমাদের বাড়িতে।"

"আর ওই বিশ হাজারের অন্তত খানিকটা ত আপনার প্রাপ্য," বললেন অম্বর সেন, "সেটা না নিয়ে যাবেন কী করে?"

"আর তোমরা তিনজনে একসঙ্গে এসেছ," বললেন শ্রীমতী রুনা, "আমার অটোগ্রাফে সই দেবে না বুঝি?"

"এন্ডস ওয়েল দ্যাট অল্‌স ওয়েল," বললেন লালমোহনবাবু।

জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা

॥ ১ ॥

'হ্যালো—প্রদোষ মিত্র আছেন?'

'কথা বলছি।'

'ধরুন—পানিহাটি থেকে কল আছে আপনার ... হ্যাঁ, কথা বলুন।'

'হ্যালো—'

'কে, মিঃ প্রদোষ মিত্র?'

'বলছি—'

'আমার নাম শংকরপ্রসাদ চৌধুরী। আমি পানিহাটি থেকে বলছি। আমি অবিশ্যি আপনার অপরিচিত, কিন্তু একটা বিশেষ অনুরোধ জানাতে আপনাকে টেলিফোন করছি।'

'বলুন।'

'আমার ইচ্ছা আপনি একবার আমার এখানে আসেন।'

'পানিহাটি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এখানেই থাকি। গঙ্গার উপরে আমাদের একটা একশো বছরের পুরোন বাড়ি আছে। নাম অমরাবতী। এখানে সকলেই জানে। আপনার কাজের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে, এবং আপনারা যে তিনজন একসঙ্গে ঘোরাফেরা করেন তাও আমি জানি। আমি আপনাদের তিনজনকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই শনিবার সকালে এসে—এই ধরুন দশটা নাগাদ—রাত্তিরটা থেকে আবার রবিবার ফিরে যাবেন।'

'কোনো অসুবিধায় পড়েছেন কি? মানে আমার পেশাটা ত জানেন; কোনো রহস্য—?'

'তা নাহলে আপনাকে ডাকব কেন বলুন? তবে সে বিষয়ে আমি ফোনে বলব না, আপনি এলে বলব। আমার বাড়িটা আপনাদের ভালোই লাগবে, ভালো ইলিশ মাছ খাওয়াব, যদি ভিডিও ক্যাসেটে ছবি দেখতে চান তাও দেখাব, আর তার উপরে আপনার মস্তিষ্ক খাটানোর খোরাকও জুটবে বলে মনে হয়।'

'আমার অবিশ্যি এখন এমনিতে কোনো এনগেজমেন্ট নেই—'

'তাহলে চলে আসুন—দ্বিধা করবেন না। তবে একটা কথা।'

'কী?'

'এখানে আমি ছাড়াও কয়েকজন থাকবেন। গোড়ায় আমি কাউকে আপনার আসল পরিচয়টা দিতে চাই না—একটা বিশেষ কারণে।'

'ছদ্মবেশ নিয়ে আসতে বলছেন?'

'সেটার হয়ত প্রয়োজন নেই। আপনি ত ফিল্মস্টার নন। যাঁরা এখানে

থাকবেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা আপনার চেহারার সঙ্গে পরিচিত নন। আপনি শুধু আপনাদের তিনজনের জন্য তিনটি ভূমিকা বেছে নেবেন। কী ভূমিকা সেটাও আমি সাজেস্ট করতে পারি।'

'কিরকম ?'

'আমার প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল চৌধুরী ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্র। তাঁর কথা পরে জানবেন, কিন্তু আমি এইটুকু বলতে পারি যে তাঁর একটা জীবনী লেখা এমনিতেও বিশেষ দরকার। আপনি যদি ধরুন তাঁর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে আসেন।'

'ভেরি গুড। আর আমার বন্ধু--মিঃ গাঙ্গুলী।'

'আপনার বাইনোকুলার আছে ?'

'তা আছে।'

'তাহলে ওঁকে পক্ষিবিদ করে দিন না। আমার বাগানে অনেক পাখি আসে; ওঁর একটা অকুপেশন হয়ে যাবে।'

'বেশ। আমার খুড়তুতো ভাইটি হবেন পক্ষিবিদের ভাইপো।'

'ব্যাস্, তাহলে ত হয়েই গেল।'

'তাহলে পরশু শনিবার সকাল দশটা ?'

'দশটা।'

'অমরাবতী ?'

'অমরাবতী। আর আমার নাম শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী।'

ফেলুদাকে অবিশ্যি টেলিফোনের পুরো ব্যাপারটা আমার জন্য রিপীট করতে হল। বলল, 'কিছু লোক আছে যাদের কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভরসা-জাগানো হৃদ্যতাপূর্ণ ভাব থাকে যে তাদের অনুরোধ এড়ানো খুব মুশকিল হয়।'

আমি বললাম, 'এড়াবে কেন ? এঁকে ত একরকম মক্কেল বলেই মনে হচ্ছে। তোমার রোজগারের কথাটাও ভাবতে হবে ত।'

আসলে ফেলুদার একটা ব্যাপার আছে। পর পর গোটা দু'তিন কেসে ভালো রোজগার হলে কিছুদিনের জন্য গোয়েন্দাগিরিতে ইস্তফা দিয়ে অন্য জিনিস নিয়ে পড়ে। সে জিনিসে অবিশ্যি রোজগার নেই, শুধু শখের ব্যাপার। এখন ওর সেই অবস্থা চলেছে। এখনকার নেশা হল আদিম মানুষ। সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকার জীবতত্ত্ববিদ্ রিচার্ড লীকির একটা সাক্ষাৎকার পড়ে ও জেনেছে যে লীকির কিছু আবিষ্কারের ফলে আদিম মানুষের উদ্ভবের সময়টা এক ধাক্কায় লাখ লাখ বছর পিছিয়ে গেছে। ফেলুদা এখন আদিম মানুষ ও তার বানর পূর্বাবস্থার ভাবনায় মশগুল। পাঁচবার গেছে মিউজিয়ামে, তিনবার ন্যাশনাল লাইব্রেরী আর একবার চিড়িয়াখানা। একদিন বলল, 'একটা থিওরিতে কী বলে জানিস ? বলে মানুষ এসেছে আফ্রিকার এক বিশেষ ধরনের খুনে বাঁদর থেকে, যাকে বলে "কিলার এপ"। আর সেই কারণেই নাকি মানুষের মজ্জায় একটা হিংস্র প্রবৃত্তি রয়ে গেছে--যেটা প্রকাশ পায় যুদ্ধে, দাঙ্গায় আর খুন-খারাপিতে।'

পানিহাটিতে মানুষের এই হিংস্র প্রবৃত্তির কোনো নমুনা ও আশা করছে কিনা জানিনা, তবে এটা জানি যে মাঝে মাঝে ওর কলকাতা ছেড়ে অন্তত কিছু-ক্ষণের জন্য বাইরে ঘুরে আসতে ভালোই লাগে। এইত সেদিন আমরা লালমোহন-বাবুর গাড়িতে গিয়ে বর্ধমানের রাস্তায় পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত ঐতিহাসিক গম্বুজ আর হিন্দু মন্দিরের উপরে তৈরি ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান মসজিদ দেখে

এলাম।

লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবু দশদিনের ছুটিতে দেশে গেছেন বলে ফেলুদাকেই তাঁর জায়গা নিতে হল। পথে যেতে যেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'দিলেন ত মশাই একটা দায়িত্ব আর একটা বাইনোকুলার আর দুখানা বই ঘাড়ে চাপিয়ে; এদিকে গড়পারে ত কাক-চড়ুই ছাড়া কোনো পাখি কোনোদিন দেখিচি বলে মনে পড়ে না।'

বই দুটো হল সেলিম আলির ইণ্ডিয়ান বার্ড্স আর অজয় হোমের বাংলার পাখি।

ফেলুদা বলল, 'কুছ পরোয়া নেহী। মনে রাখবেন, কাক হল করভাস স্প্লেন্ডেন্স, চড়ুই হল পাসের ডোমেস্টিকাস। সব সময় ল্যাটিন নাম বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে যাবে, তাই ইংরিজি নামও ব্যবহার করতে পারেন—যেমন ফিঙেকে ড্রঙ্গো, টুনটুনিকে টেলর বার্ড, ছাতারেকে জাঙ্গল ব্যাবলার। আর পাখি না দেখলেও, মাঝে মাঝে বাইনোকুলার চোখে লাগালেই অনেকটা কাজ দেবে।'

'আমার নামও ত একটা চাই,' বললেন লালমোহনবাবু।

'আপনি হলেন ভবতোষ সিংহ, আপনার ভাইপো প্রবীর আর আমি সোমেশ্বর রায়।'

পৌনে নটায় রওনা হয়ে আমরা দশটা বেজে পাঁচে পানিহাটিতে শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়ি অমরাবতীতে পৌঁছে গেলাম। আমাদের গাড়ি দেখেই বন্দুক-ধারী গুর্খা দারোয়ান এসে বিকট ক্যাঁচ শব্দে লোহার গেট খুলে দিল।

ফেলুদা বলে, 'গল্পের শুরুতেই একগাদা বর্ণনা হুড় হুড় করে ঢেলে দিলে পাঠক হাবুডুবু খায়; ওটা দিবি গল্পের ফাঁকে ফাঁকে।' তাই শুধু বলছি—বিশাল জমির ওপর লাল বাড়িটা পেল্লায়, থমথমে আর অনেকটা বিলিতি কাস্লের ধাঁচে তৈরি। বাড়ির দক্ষিণে ফুলবাগান, তার পরে গাছপালা রাখার কাঁচের ঘর, আর তারও পরে ফলবাগান। নুড়ি বিছানো প্যাঁচালো পথ দিয়ে আমরা সদর দরজায় পৌঁছলাম।

বাড়ির মালিক গাড়ির শব্দ পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমরা নামলে হেসে বললেন, 'ওয়েলকাম্ টু অমরাবতী।' এঁর বর্ণনা হল—মাঝারি হাইট, ফরসা রং, বয়স পঞ্চাশ-টঞ্চাশ। পরনে পায়জামা আর আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে শুঁড় তোলা লাল চটি, ডান হাতে চুরুট।

'আমার খুড়তুতো ভাই জয়ন্তও কাল এসেছে, তাকেও দলে টেনে নিয়েছি। অর্থাৎ সে আপনাদের আসল পরিচয় জানলেও অন্যদের সামনে প্রকাশ করবে না।'

'অন্যরা কি এসে গেছেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'না। তাঁরা আসবেন বিকেলে। চলুন, একটু বসে জিরোবেন। আর সেই সুযোগে কিছু কথাও হবে।'

আমরা বাড়ির পশ্চিমদিকের বিরাট চওড়া বারান্দায় গিয়ে বসলাম। সামনে দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে, দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়। অমরাবতীর প্রাইভেট ঘাটও দেখতে পাচ্ছি সামনে ডান দিকে। একটা তোরণের নিচ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে জল অবধি।

'ওই ঘাট কি ব্যবহার হয়?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'হয় বৈকি,' বললেন শঙ্করবাবু। 'আমার খুড়ীমা থাকেন ত এখানে। উনি রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করেন।'

'উনি একা থাকেন এ বাড়িতে?'

'একা কেন? আমিও ত দু বছর হল এখানেই থাকি। টিটাগড় আমার কাজের জায়গা। কলকাতায় আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির চেয়ে এ বাড়ি অনেক কাছে হয়।

'আপনার খুড়ীমার বয়স কত?'

'সেভেনটি এইট। আমাদের পুরোন চাকর অনন্ত ওঁর দেখাশোনা করে। এমনিতে মোটামুটি শক্তই আছেন, তবে ছানি কাটাতে হয়েছে কিছুদিন হল, দাঁতও বেশি বাকি নেই, আর মাথায় সামান্য ছিট দেখা দিয়েছে। নাম ভুলে যান, খেতে ভুলে যান, মাঝরাত্তিরে পান ছাঁচতে বসেন—এই আর কি। ঘুম ত এমনিতে খুবই কম-- রাত্তিরে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি নয়। আসলে চার বছর আগে কাকা মারা যাবার পর উনি আর কলকাতায় থাকতে চাননি। এখানে থাকাটা ওঁর কাছে একরকম কাশীবাসের মতো।'

বেয়ারা ট্রেতে করে চা আর মিষ্টি নিয়ে এল।

'দুপুরে খেতে খেতে সেই একটা-দেড়টা হবে,' বললেন শঙ্করবাবু, 'কাজেই আপনারা মিষ্টিটার সদ্ব্যবহার করুন। এ মিষ্টি কলকাতায় পাবেন না।'

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, 'আমাদের আসল আর নকল দুটো পরিচয়ই ত জানেন, এবার আপনাদের পরিচয়টা পেলে ভালো হত। আপনি কী করেন জিগ্যেস করাটা কি অভদ্রতা হবে?'

'মোটেই না,' বললেন শঙ্করবাবু। 'আপনাকে ডেকেছি ত সব কথা খুলে বলার জন্যেই; নাহলে আপনি কাজ করবেন কি করে?—সোজা কথায় আমি হলাম ব্যবসাদার। বুঝতেই পারছেন, এত বড় বাড়ি যখন মেনটেন করছি তখন ব্যবসা আমার মোটামুটি ভালোই চলে।'

'আপনার কি বংশানুক্রমিক ব্যবসা?'

'না। এ বাড়ি তৈরি করেন আমার প্রপিতামহ—বনোয়ারিলাল চৌধুরী।'

'অর্থাৎ যাঁর জীবনী লিখতে যাচ্ছি আমি?'

'এগজ্যাক্টলি। তিনি ছিলেন রামপুরের ব্যারিস্টার। অগাধ পয়সা করে শেষ বয়সে কলকাতায় চলে আসেন; এসে এই বাড়িটা তৈরি করেন। উনি এখানেই থাকতেন, এখানেই মৃত্যু হয়। ঠাকুরদাদাও ব্যারিস্টার ছিলেন, তবে তাঁর পসার আমার প্রপিতামহের মতো ছিল না। তার দুটো কারণ—জুয়া আর মদ। তার ফলে চৌধুরী পরিবারের অবস্থা কিছুটা পড়ে যায়। বাড়িতে বনোয়ারিলালের কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল -সেগুলোর কথায় পরে আসছি—তার কিছু আমার ঠাকুরদাদা বিক্রী করে দেন। ব্যবসা শুরু করেন আমার বাবা, আর তার ফলে বংশের ভিত খানিকটা মজবুত হয়। তারপর আমি।'

'আর আপনার খুড়তুতো ভাই?'

'জয়ন্ত ব্যবসায় যায়নি। সে আছে এক এনজিনিয়ারিং ফার্মে। ভালোই রোজগার করে, তবে ইদানীং শুনছি ক্লাবে গিয়ে পোকার খেলছে। ঠাকুরদাদার একটা গুণ পেয়েছে আর কি? জয়ন্ত আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট।'

এই ফাঁকে ফেলুদা পকেট থেকে তার মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডারটা বার করে চালু করে দিয়েছে। এটা হংকং থেকে আনা। আজকাল মক্কেলের কথা খাতায় না লিখে রেকর্ডারে তুলে নেয়, তাতে অনেক বেশি সুবিধা হয়।

শঙ্করবাবু বললেন, 'আত্মীয়ের কথা ত হল, এবার অনাত্মীয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক।'

'তার আগে একটা প্রশ্ন করে নিই,' বলল ফেলুদা। 'যদিও প্রায় ঘষে উঠে গেছে, তবুও মনে হচ্ছে আপনার কপালে একটা চন্দনের ফোঁটা দেখতে পাচ্ছি। তার মানে—'

'তার মানে আর কিছুই না, আজ হল আমার জন্মতিথি। ফোঁটাটা দিয়েছেন খুড়ীমা।'

'জন্মতিথি বলেই কি আজ এখানে অতিথি সমাগম হবে?'

'অতিথি বলতে মাত্র তিনজন। গত বছর ছিল ফিফ্‌টিয়েথ বার্থডে, সেবারও ডেকেছিলাম এই তিনজনকেই। ভেবেছিলাম ওই একটি বারই তিথি পালন করব। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবারও করছি। বুঝতেই পারছেন, এবাড়িতে যাঁরা একবার এসেছেন, তাঁদের দ্বিতীয়বার আসতে কোনো আপত্তি হবে না।'

'এই দ্বিতীয়বারের কারণটা কী?'

শঙ্করবাবু একটু ভেবে বললেন, 'খুব ভালো হয় আপনারা যদি চা খেয়ে একবারটি দোতলায় আসেন আমার সঙ্গে—আমার খুড়ীমার ঘরে। তাহলে বাকি ঘটনাটা বুঝতে সহজ হবে। আর আমিও ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে পারব।'

আমরা মিনিটখানেকের মধ্যেই উঠে পড়লাম।

সিঁড়িতে পৌঁছাতে হলে বৈঠকখানা দিয়ে যেতে হয়। এখানে বলে রাখি—বাহারের আসবাব, কার্পেট, মখমলের পর্দা, ঝাড়লণ্ঠন, শ্বেতপাথরের মূর্তি ইত্যাদি মিলিয়ে এমন জমজমাট বৈঠকখানা আমি বেশি দেখিনি।

সিঁড়ি উঠতে উঠতে ফেলুদা বলল, 'আপনার খুড়ীমা ছাড়া দোতলায় আর কে থাকেন?'

'খুড়ীমা থাকেন উত্তর প্রান্তে,' বললেন শঙ্করবাবু, 'আর দক্ষিণে থাকি আমি। জয়ন্ত এলেও দক্ষিণেরই একটা ঘরে থাকে।'

দোতলার ল্যান্ডিং পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম খুড়ীমার ঘরে। বেশ বড় ঘর, কিন্তু এতে কোনো জাঁকজমক নেই। পশ্চিমে দরজার বাইরে আলো আর বাতাসের বহর দেখে বোঝা যায় ওদিকেই গঙ্গা। দরজার পাশেই বুড়ি মাদুরে বসে মালা জপছেন। তাঁর পাশে একটা হামানদিস্তা, একটা পানের বাটা আর একটা মোটা বই। নির্ঘাত রামায়ণ কি মহাভারত হবে। আসবাব বলতে একটা খাট আর একটা ছোট আলমারি।

আমরা ঘরে ঢুকতেই খুড়ীমা মাথা তুলে পুরু চশমার ভিতর দিয়ে আমাদের দিকে চাইলেন।

'কজন অতিথি এসেছেন কলকাতা থেকে,' বললেন শঙ্করবাবু।

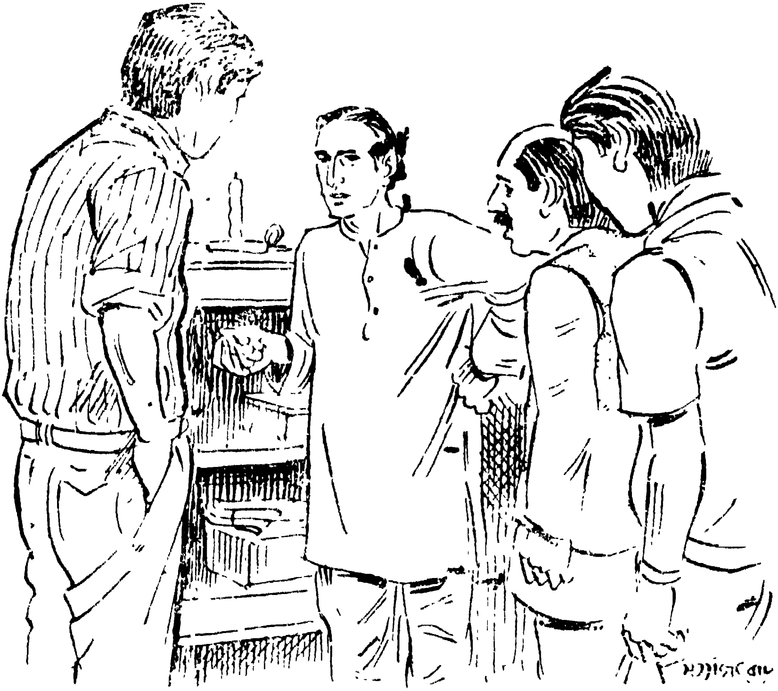
'তাই এই ঘাটের মড়াকে দেখাতে আনলি?'

আমরা তিনজনে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে বৃদ্ধা বললেন, 'তা বাপু তোমাদের পরিচয় জেনে আর কী হবে, নাম ত মনে থাকবে না। নিজের নামটাই ভুলে যাই মাঝে মাঝে। এখন ত বসে বসে দিন গোনা।'

'আসুন—'

শঙ্করবাবুর ডাকে আমরা ঘুরলাম। বৃদ্ধা আবার বিড়বিড় করে মালা জপতে শুরু করলেন।

এবার দেখলাম ঘরের উল্টোদিকে খাটের পাশে একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক রয়েছে। শঙ্করবাবু পকেট থেকে চাবি বার করে সিন্দুকটা খুলতে খুলতে বললেন, 'এবারে আপনাদের যে জিনিস দেখাব সে হল আমার প্রপিতামহের সম্পত্তি। রামপুরে



থাকতে বহু নবাব-তালুকদার তাঁর মক্কেল ছিলেন। এগুলো তাঁদের উপঢৌকন। এরই বেশ কিছু আমার ঠাকুরদাদা বিপাকে পড়ে বেচে দিয়েছিলেন। তবে তার পরেও কিছু আছে। যেমন এই যে দেখুন—'

শঙ্করবাবু একটা থলি বার করে তার মুখটা ফাঁক করে হাতের তেলোয় উপুড় করলেন। ঝন ঝন করে কিছু গোল চাকতি তেলোয় পড়ল।

'জাহাঙ্গীরের আমলের স্বর্ণমুদ্রা,' বললেন শঙ্করবাবু। 'দেখুন, প্রত্যেকটিতে একটি করে রাশির ছবি খোদাই করা। এ জিনিস একেবারেই দুষ্প্রাপ্য।'

'রাশিচক্র হলে এগারোটা কেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল। 'বারোটা হওয়া উচিত নয় কি?'

'একটি মিসিং।'

আমরা পরস্পরের দিকে চাইলাম।

'আরো জিনিস আছে,' বললেন শঙ্করবাবু, 'সেগুলো এই আইভরির বাক্সটার মধ্যে। সোনার উপর চুনি বসানো ইটালিয়ান নস্যির কৌটো, জেড পাথরে চুনি আর পান্না বসানো মোগল সুরাপাত্র, আংটি, লকেট...কিন্তু সে সব আপনারা দেখবেন আজ সন্ধ্যাবেলা, সর্বসমক্ষে। এখন নয়।'

'এর চাবি ত আপনার কাছেই থাকে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ, আমার কাছেই। একটা ডুপলিকেট আছে, থাকে খুড়ীমার আলমারিতে।'

'কিন্তু সিন্দুক আপনার ঘরে নয় কেন?

'এ ঘরটা অতীতে ছিল আমার প্রপিতামহের ঘর। সিন্দুক তারই আমলের। ওটা আর সরাইনি। আর কড়া পাহারা আছে গেটে, এ ঘরে খুড়ীমা প্রায় সর্বক্ষণ থাকেন, তাই এক হিসেবে ওটা এখানে যথেষ্ট সেফ।'

আমরা আবার নিচের বারান্দায় ফিরে এলাম। চেয়ারে বসার পর ফেলুদা টেপরেকর্ডার চালু করে দিয়ে বলল, 'একটি মুদ্রা মিসিং হল কি করে?'

'সে কথাই ত বলছি, বললেন শঙ্করবাবু। 'তিনজনকে উইক এন্ডে নেমন্তন্ন করেছিলাম গত জন্মতিথিতে। একজন হলেন আমার বিজনেস পার্টনার নরেশ কাঞ্জিলাল। আরেকজন এখানকারই ডাক্তার অর্ধেন্দু সরকার। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলেন কালীনাথ রায়। ইনি ইস্কুলে আমার সহপাঠী ছিলেন; পঁয়ত্রিশ বছর পরে আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমার প্রপিতামহের মহামূল্য সম্পত্তির কথা এঁরা সকলেই শুনেছিলেন, কিন্তু চোখে দেখেননি। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত্তিরে ডিনারের পর জয়ন্ত সিন্দুক থেকে স্বর্ণমুদ্রার থলিটা বার করে নিচে বৈঠকখানায় আনে। কয়েনগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে রেখেছি, সকলে ঘিরে দেখছে, এমন সময় হল লোডশেডিং। ঘর অন্ধকার। এটা অবিশ্যি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। চাকর দুমিনিটের মধ্যে মোমবাতি নিয়ে আসল, আমি কয়েনগুলো তুলে নিয়ে আবার সিন্দুকে রেখে এলাম। একটা যে কমে গেছে সেটা তখন খেয়াল করিনি। এমন যে হতে পারে কল্পনাও করিনি। পরদিন সকলে চলে যাবার পর মনে একটা খটকা লাগাতে সিন্দুক খুলে দেখি কর্কট রাশির মুদ্রাটি নেই।'

'কয়েনগুলো আপনিই তুলে রেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমি। ব্যাপারটা বুঝুন মিঃ মিত্তির। তিনজন নিমন্ত্রিত। একজনকে পঁচিশ বছর চিনি—আমার বিজনেস পার্টনার। অর্ধেন্দু সরকার হলেন ডাক্তার এবং ভালোই ডাক্তার। খড়দা টিটাগড় থেকে কল আসে ওঁর। আর কালীনাথ আমার বাল্যবন্ধু।'

'কিন্তু এঁদের সকলকেই কি অনেস্ট লোক বলে জানেন আপনি?'

'সেখানেই অবিশ্যি গণ্ডগোল। কাঞ্জিলালের কথা ধরুন। ব্যবসায় অনেকেই জেনেশুনে অসৎ পন্থা নেয়, কিন্তু কাঞ্জিলালের মতো এমন অম্লান বদনে নিতে আমি আর কাউকে দেখিনি। আমাকে ঠাট্টা করে বলে—তুমি ধর্মযাজক হয়ে যাও, তোমার দ্বারা ব্যবসা হবে না।'

'আর অন্য দুজন?'

'ডাক্তারের কথা আমি জানি না। খুড়ীমা মাঝে মাঝে বাতে ভোগেন, ডাক্তার তাঁকে এসে দেখে যান। এর বেশি জানি না। তবে কালীনাথ বোধহয় গভীর জলের মাছ। এক যুগ দেখা নেই, হঠাৎ একদিন টেলিফোন করে আমার কাছে এল। বলল—বয়স যত বাড়ছে ততই পুরোন দিনের কথা মনে পড়ে। তাই একবার ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করি।'

'আপনি তাঁকে দেখেই চিনেছিলেন?'

'তা চিনেছিলাম। তাছাড়া ইস্কুলের বহু পুরোন গল্প করল। সে যে আমার সহপাঠী তাতে সন্দেহ নেই। গোলমালটা হচ্ছে, সে যে এখন কী করে তা কিছুতেই ভেঙে বলে না। জিগ্যেস করলেই বলে, ধরে নাও তোমারই মতো ব্যবসা করে। এদিকে গুণ যে নেই তা নয়। খুব আমুদে রসিক লোক। ইস্কুলে থাকতে ম্যাজিক দেখাত, এখনো সে অভ্যাসটা রেখেছে। হাত সাফাই রীতিমতো

ভালো।'

'আপনার ভাইও ত অন্ধকারের মধ্যে ঘরে ছিলেন।'

'সে ছিল। তবে সে ত এ জিনিস আগে দেখেছে, তাই সে টেবিলের কাছে ছিল না। নিয়ে থাকলে ওই তিনজনের একজনই নিয়েছে।'

'তারপর আপনি কী করলেন?'

'কী আর করতে পারি বলুন। এমন লোক আছে যারা এই অবস্থায় সোজা-সুজি পুলিশ ডেকে তিনজনের বাড়ি সার্চ করাতো। কিন্তু আমি পারিনি। ওই তিনজনের সঙ্গে বসে কত ব্রিজ খেলেছি, আর তাদের একজনকে বলব চোর?'

'তার মানে স্রেফ হজম করে গেলেন ব্যাপারটা?'

'স্রেফ হজম করে গেলাম। ফলে এখনো কেউ জানেই না যে আমি ব্যাপারটা টের পেয়েছি। সেই ঘটনার পরেও ত এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে কতবার, কিন্তু কেউ ত কোনোরকম অসোয়াস্তি বা অপরাধ বোধ করছে বলে মনে হয়নি। অথচ আমি জানি যে এই তিনজনের মধ্যেই একজন দোষী। একজন চোর।'

আমরা তিনজনেই চুপ। ঘটনাটা অদ্ভুত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ অবস্থায় কী করা যায়?

আমার মনের প্রশ্নটা ফেলুদাই করল। শঙ্করবাবু বললেন, 'এরা জানে যে আমি এদের সন্দেহ করি না। তাই এদের আবার ডেকেছি, এবং আজ রাত্রে আমি আবার এদের সামনে বনোয়ারিলালের কিছু মূল্যবান জিনিস বার করব। মাস-খানেক থেকে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা সাতটায় লোড শেডিং হচ্ছে এখানে। তার ঠিক আগে আমি জিনিসগুলো টেবিলে সাজাব। ঘর আবার অন্ধকার হবে। আশা করছি সেই অন্ধকারে চোরের প্রবৃত্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে এই সম্পত্তির মূল্য চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখের কম নয়। হয়ত আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস চোর লোভ সামলাতে পারবে না। চুরির পর আপনি আপনার আসল ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। তখন প্রদোষ মিত্তিরের কাজ হবে চোর ধরা এবং চোরাই মাল বার করা।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার ভাই এ সম্বন্ধে কী বলেন?'

'সেও ত কাল অবধি কিছুই জানত না,' বললেন শঙ্করবাবু, 'কাল আপনাকে ইনভাইট করার পর ওকে বলি।'

'উনি কী বললেন?'

'খুব চোটপাট করল। বলল—তুমি অ্যাদ্দিন চেপে রেখেছ ব্যাপারটা—তখন-তখনই পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল। এক বছর পরে কি মিঃ মিত্তির কিছু করতে পারবেন, ইত্যাদি।'

'একটা কথা বলব মিঃ চৌধুরী?'

'বলুন।'

'আপনি মানুষটা এত নরম বলেই কিন্তু চোর তার সুযোগটা নিয়েছিল। অতিথিকে চুরির অপবাদ দিতে সবাই পেছপা হত না।'

'সেটা জানি। সেই জন্যই ত আপনাকে ডাকা। আমি যেটা পারিনি, সেটা আপনি পারবেন।'

॥ ২ ॥

সর্ষে বাটা দিয়ে চমৎকার গঙ্গার ইলিশ সমেত দুপুরের খাওয়াটা হল ফার্স্ট ক্লাস। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আলাপ হল খাবার টেবিলেই। ইনি মাঝারি হাইটের চেয়েও কম, বেশ সুস্থ, সবল মানুষ। শঙ্করবাবুর পার্সোনালিটি এ'র নেই, কিন্তু বেশ হাসিখুশি চালাক চতুর লোক।

খাবার পর শঙ্করবাবু বললেন, 'আপনাদের এখন আর ডিস্টার্ব করব না, যা মন চায় করুন। আমি একটু গড়িয়ে নিই। বিকেলে চায়ের সময় বারান্দায় আবার দেখা হবে।'

আমরা জয়ন্তবাবুর সঙ্গে বাড়ির আশপাশটা ঘুরে দেখব বলে বেরোলাম।

পশ্চিম দিকে একটানা একটা নিচু থামওয়ালা পাঁচিল চলে গেছে নদীর ধার দিয়ে। পাঁচিলের পরেই জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে জল অবধি। এই পাঁচিলই বাকি তিনদিকে হয়ে গেছে দেড় মানুষ উঁচু। জয়ন্তবাবুর ফুলের শখ, তাই তিনি আমাদের বাগানে নিয়ে গিয়ে গোলাপ সম্বন্ধে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে দিলেন। গোলাপ যে তিনশো রকমের হয় তা এই প্রথম জানলাম।

বাড়ির উত্তরে গিয়ে দেখলাম সেদিকে আরেকটা গেট রয়েছে। শহরে কোথাও যেতে হলে এই গেটটাই নাকি ব্যবহার করা হয়।

আরেকটা সিঁড়িও রয়েছে এদিকে। জয়ন্তবাবু বললেন খুড়ীমা, মানে ওঁর মা, গঙ্গাস্নানে যেতে ওটাই ব্যবহার করেন। একতলায় নদীর দিকে আর গঙ্গার দিকে চওড়া বারান্দা, দুদিক দিয়েই সিঁড়ি রয়েছে নিচে নামার জন্য।

দেখা শেষ হলে পর আমরা ঘরে ফিরে এলাম। জয়ন্তবাবু কাঁচের ঘরে চলে গেলেন অর্কিড দেখার জন্য।

আমাদের থাকার জন্য একতলায় একটা প্যাসেজের এক দিকে পর পর দুটো ঘর দেওয়া হয়েছে। উল্টোদিকে আরো তিনটে পাশাপাশি ঘর দেখে মনে হল তাতেই বোধহয় তিনজন অতিথি থাকবেন। ঘরে ঢুকে বাহারে খাটে নরম বিছানা দেখে লালমোহনবাবু বোধহয় দিবানিদ্রার তাল করছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললেন, 'পাখির বইগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার।'

আমি একটা কথা ফেলুদাকে না জিগ্যেস করে পারলাম না।

'আচ্ছা, এক বছর আগে যে লোক চুরি করেছে, সে যদি এবার আর চুরি না করে, তাহলে তুমি চোর ধরবে কি করে?'

ফেলুদা বলল, 'সেটা এই তিন ভদ্রলোককে স্টাডি না করে বলা শক্ত। যার মধ্যে চুরির প্রবৃত্তি রয়েছে, তার সঙ্গে আর পাঁচটা অনেস্ট লোকের একটা সূক্ষ্ম তফাত থাকা উচিত। চোখ-কান খোলা রাখলে সে তফাত ধরা পড়তে পারে। ভুলিস না, যে লোক চুরি করে তার বাইরেটা যতই পালিশ করা হোক না কেন তাকে আর ভদ্রলোক বলা চলে না। সত্যি বলতে কি, ভদ্রলোক সাজার জন্য তাকে যথেষ্ট অভিনয় করতে হয়।'

বিকেলে পর পর দুটো গাড়ির আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম অতিথিরা এসে গেছেন। বারান্দায় চায়ের আয়োজন হলে পর শঙ্করবাবুই আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন তিন গেস্টের সঙ্গে আলাপ করানোর জন্যে।

ডাঃ সরকার এক মাইলের মধ্যেই থাকেন, ইনি হেঁটেই এসেছেন। বছর পঞ্চাশ বয়স, চোখে চশমা, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, গোঁফটা কাঁচা হলেও, কানের



পাশের চুলে পাক ধরেছে।

নরেশ কাঞ্জিলাল বিরাট মানুষ, ইনি সুট-টাই পরে সাহেব সেজে এসেছেন। ফেলুদার পরিচয় জেনে বললেন, 'বনোয়ারিলালের জীবনী লেখার কথা আমি শংকরকে অনেকবার বলেছি। আপনি এ কাজের ভারটা নিয়েছেন শুনে খুশি হলাম। হি ওয়াজ এ রিমার্কেবল ম্যান।'

মজার লোক হলেন কালীনাথ রায়। এঁর কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে, তাতে হয়ত ম্যাজিকের সরঞ্জাম থাকতে পারে। লালমোহনবাবুর সংগে পরিচয় হতেই বললেন, 'পক্ষিবিদ্ যে মুরগীর ডিম পকেটে নিয়ে ঘোরে তা তো জানতুম না মশাই।' কথাটা বলেই খপ্ করে লালমোহনবাবুর পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা মুরগীর ডিমের সাইজের মসৃণ সাদা পাথর বার করে দিয়ে আক্ষেপের সুরে বললেন, 'এ হে হে, এ যে দেখছি পাথর! আমি ত ফ্রাই করে খাবার মতলব করেছিলুম।'

কথা হল রাত্তিরে খাবার পর কালীনাথবাবু তাঁর হাতসাফাই দেখাবেন।

সূর্য হেলে পড়েছে, গঙ্গার জল চিক্ চিক্ করছে, ঝিরঝিরে হাওয়া, তাই

বোধহয় নরেশবাবু আর কালীনাথবাবু নেমে গেলেন বাইরের শোভা উপভোগ করতে। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উস্‌খুস্‌ করছিলেন, এবার বাইনো-কুলার বার করে উঠে পড়ে বললেন, 'দুপুরে যেন একটা প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচারের ডাক শুনেছিলুম। দেখি তো পাখিটা আশেপাশে আছে কিনা।'

ফেলুদার গম্ভীর মুখ দেখে আমিও হাসিটা কোনোমতে চেপে গেলাম।

ডাক্তার সরকার চায়ে চুমুক দিয়ে শঙ্করবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার ভ্রাতাটিকে দেখছি না—সে কি বাগানে ঘুরছে নাকি?'

'ওর ফুলের নেশার কথা ত আপনি জানেন।'

'ওঁকে ত বলেছি মাথায় টুপি না পরে যেন রোদে না ঘোরেন। সে আদেশ তিনি মেনেছেন কি?'

'জয়ন্ত কি ডাক্তারের আদেশ মানার লোক? আপনি তাকে চেনেন না?'

ফেলুদা যে চারমিনার হাতে আড়চোখে ডাক্তারের কথাবার্তা হাবভাব লক্ষ্য করে যাচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

'আপনার খুড়ীমা কেমন আছেন?' শঙ্করবাবুর দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন ডাঃ সরকার।

'এমনিতে ত ভালোই,' বললেন শঙ্করবাবু, 'তবে অরুচির কথা বলছিলেন যেন। আপনি একবার ঢুঁ মেরে আসুন না।'

'তাই যাই।'

ডাঃ সরকার চলে গেলেন খুড়ীমাকে দেখতে। প্রায় একই সঙ্গে জয়ন্তবাবু ফিরে এলেন বাগান থেকে—ঠোঁটের কোণে হাসি।

'কী ব্যাপার? হাসির কি হল?' জিজ্ঞেস করলেন শঙ্করবাবু।

জয়ন্তবাবু টি পট থেকে কাপে চা ঢেলে নিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার বন্ধু কিন্তু চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে বেদম অভিনয় করে যাচ্ছেন পক্ষিবিদের।'

ফেলুদাও হেসে বলল, 'অভিনয় ত আজ সকলকেই করতে হবে অল্পবিস্তর। আপনার দাদার পরিকল্পনাটাই ত নাটকীয়।'

জয়ন্তবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'আপনি কি দাদার পরিকল্পনা অ্যাপ্রুভ করেন?'

'আপনি করেন না বলে মনে হচ্ছে?' বলল ফেলুদা।

'মোটেই না,' বললেন জয়ন্তবাবু। 'আমার ধারণা চোর অত্যন্ত সেয়ানা লোক। সে কি আর বুঝবে না যে তার জন্য ফাঁদ পাতা হচ্ছে? সে কি জানে না যে দাদা অ্যাদ্দিনে টের পেয়েছে যে সিন্দুকের একটি মূল্যবান জিনিস গায়েব হয়ে গেছে?'

'সবই বুঝি,' বললেন শঙ্করবাবু, 'কিন্তু তাও আমি ব্যাপারটা ট্রাই করে দেখতে চাই। ধরে নাও এটা আমার গোয়েন্দা কাহিনীপ্রীতির ফল।'

'তুমি কি সিন্দুকের বাকি সব জিনিসই বার করতে চাও?'

'না। শুধু ইটালিয়ান নস্যির কৌটো আর মোগলাই সুরাপাত্র। ডাঃ সরকার খুড়ীমাকে দেখতে গেছেন। উনি এলেই তুমি ওপরে গিয়ে জিনিস দুটো বার করে আনবে। আমি পকেটে রেখে দেব। এই নাও চাবি।'

জয়ন্তবাবু অনিচ্ছার ভাব করে চাবিটা নিলেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ডাঃ সরকার ফিরে এলেন। ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'দিব্যি ভালো আছেন আপনার খুড়ীমা। বারান্দায় বসে দুধভাত খাচ্ছেন।

আপনাদের আরো অনেকদিন জ্বালাবেন।'

জয়ন্তবাবু চুপচাপ উঠে পড়লেন।

'কী বসে আছেন চেয়ারে?' ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন ডাঃ সরকার। 'চলুন একটু হাওয়া খাবেন। এ হাওয়া কলকাতায় পাবেন না।'

শঙ্করবাবু সমেত আমরা চারজনই সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। বাঁয়ে চেয়ে দেখি লালমোহনবাবু বাগানের মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে এদিক ওদিক দেখছেন। 'পেলেন আপনার প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচারের দেখা?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'না, তবে এইমাত্র একটা জাঙ্গল ব্যাবলার দেখলুম মনে হল।'

'এখন পাখিদের বাসায় ফেরার সময়,' বলল ফেলুদা। 'এর পরে প্যাঁচা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না।'

বাকি দুজনে গেলেন কোথায়? বাড়ির সামনের দিকে কি, না কাঁচের ঘরের পিছনে ফলবাগানে?

শঙ্করবাবুর বোধহয় একই প্রশ্ন মনে জেগেছিল, কারণ উনি হাঁক দিয়ে উঠলেন—'কই হে, নরেশ? কালীনাথ গেলে কোথায়?'

'একজনকে দেখলুম এদিকের সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতে,' বললেন লালমোহনবাবু।

'কোনজন?' প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'বোধহয় সেই ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোক।'

কিন্তু লালমোহনবাবু ভুল দেখেছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন কালীনাথবাবু নয়, নরেশ কাঞ্জিলাল।

'সন্ধের দিকে ঝপ করে টেমপারেচারটা পড়ে,' বললেন কাঞ্জিলাল, 'তাই আলোয়ানটা চাপিয়ে এলাম।'

'আর কালীনাথ?' প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'সে তো বাগানে নেমেই আলাদা হয়ে গেল। বলছিল শুকনো ফুলকে টাটকা করে দেবার একটা ম্যাজিক দেখাবে, তাই—'

মিঃ কাঞ্জিলালের কথা আর শেষ হল না, কারণ সেই সময় বুড়ো চাকর অনন্তর চিৎকার শোনা গেল।

'দাদাবাবু!'

অনন্ত গঙ্গার দিকের বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নেমে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ছুটে এল আমাদের দিকে।

'কী হল অনন্ত?' শঙ্করবাবু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করে এগিয়ে গেলেন।

'ছোট দাদাবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন দোতলায়।'

॥ ৩ ॥

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ল্যান্ডিং পেরিয়েই খুড়ীমার ঘর, সেটা আগেই বলেছি। জয়ন্তবাবু সেই ঘরের চৌকাঠের হাত তিনেক এদিকে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর মাথার পিছনের মেঝেতে খানিকটা রক্ত চুঁইয়ে পড়েছে।

ডাক্তার সরকার দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে সবচেয়ে আগে পৌঁছে জয়ন্তবাবুর

নাড়ী টিপে ধরলেন। ফেলুদাও প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছে জয়ন্তবাবুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে। তার মুখ গম্ভীর, কপালে খাঁজ।

'কী মনে হচ্ছে?' চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'পাল্‌স সামান্য দ্রুত,' বললেন ডাঃ সরকার।

'মাথার জখমটা?'

'মনে হচ্ছে পড়ে গিয়ে হয়েছে। এই সময় খালি মাথায় রোদে ঘোরা ডেনজারাস সেটা অনেকবার বলেছি ওঁকে।'

'কনকাশন—?'

'সেটা ত পরীক্ষা না করে বলা সম্ভব না। আজ আবার আমি যন্ত্রপাতি কিছুই আনিনি সঙ্গে। একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ভালো হত।'

'তাই করুন না। গাড়ি ত রয়েছে।'

ভদ্রলোক বেশ ভালো ভাবেই অজ্ঞান হয়েছেন, কারণ ফেলুদা সমেত চারজন ধরাধরি করে গাড়িতে তোলার সময়ও তাঁর জ্ঞান হল না। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অবিশ্যি কালীনাথবাবুর সঙ্গেও দেখা হল। বললেন, 'আমি জাস্ট ওষুধটা খাবার জন্য ঘরে গেছি—আর তার মধ্যে এই কাণ্ড!'

'আমি সঙ্গে আসব কি?' শঙ্করবাবু ডাক্তারকে জিগ্যেস করলেন।

'কোনো দরকার নেই,' বললেন ডঃ সরকার, 'আমি হাসপাতাল থেকে আপনাকে ফোন করব।'

গাড়ি চলে গেল। এই দুর্ঘটনার জন্য শঙ্করবাবুর প্ল্যান যে ভেস্তে গেল সেটা বুঝতে পারছি। বেচারী ভদ্রলোকের জন্মতিথিতে এমন একটা ঘটনা ঘটার জন্য আমারও খারাপ লাগছিল।

আমরা সবাই এসে বসবার ঘরে বসেছিলাম, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা কেন যে 'আমি আসছি' বলে উঠে গেল তা জানি না। অবিশ্যি মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আবার ফিরে এল।

শঙ্করবাবু অতিথিদের সামনে যথাসম্ভব স্বাভাবিক হাসিখুশি ব্যবহার করছিলেন। এমনকি তাঁর আশ্চর্য প্রপিতামহ সম্বন্ধে অদ্ভুত সব ঘটনাও বলছিলেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে সেটা করতে তাঁর বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে চলার পর হাসপাতাল থেকে ডাঃ সরকারের ফোন এল। জয়ন্তবাবুর জ্ঞান হয়েছে। তিনি অনেকটা ভালো। মনে হচ্ছে কাল সকালেই আসতে পারবেন।

এই সুখবরের পর অবিশ্যি ঘরের আবহাওয়া খানিকটা হালকা হল, কিন্তু আমি জানি যে শঙ্করবাবুর মোটেই ভালো লাগছে না কারণ চোরের রহস্য রহস্যই থেকে যাবে।

খাওয়া দাওয়ার পর, ভিডিও-ক্যাসেটে ছবি দেখতে চাই কিনা জিগ্যেস করাতে আমরা সকলেই না বললাম। এ অবস্থায় ফুর্তি চলে না। তাই ম্যাজিকও বাদ পড়ল।

সকলকে গুড নাইট জানিয়ে নিজেদের ঘরে আসতেই আমি যে প্রশ্নটা ফেলুদাকে করব ভাবছিলাম, সেটা লালমোহনবাবু করে ফেললেন।

'আপনি তখন ফস্‌ করে বেরিয়ে কোথায় গেলেন মশাই?'

'খুড়ীমার ঘরে।'

'খুড়ীমাকে দেখতে গেসলেন?' অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'সেই সঙ্গে অবিশ্যি সিন্দুকের হাতল ধরে একটা টানও দিয়ে এলাম।'

'খোলা নাকি?'

'বন্ধ। সেটাই স্বাভাবিক। যে ভাবে ঘরের দরজার দিকে পা করে পড়েছিলেন ভদ্রলোক, তাতে মনে হয় ঘরে ঢোকার আগেই পড়েছেন।'

'কিন্তু চাবিটা কোথায়, ফেলুদা?' আমি জিগ্যেস করলাম। প্রশ্নটা কিছুক্ষণ থেকেই আমার মাথায় ঘুরছিল।

ফেলুদা বলল, 'শঙ্করবাবু হয়ত দুর্ঘটনায় ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।'

কথাটা বলতে বলতেই শঙ্করবাবু এসে ঢুকলেন আমাদের ঘরে। 'দেখুন ত কী বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল!' বললেন ভদ্রলোক। 'জয়ন্তর আরেকবার এরকম হয়েছিল। ওর ব্লাড প্রেশারটা একটু বেশি নেমে যায় মাঝে মাঝে।'

'ফোনে আর কী বললেন ডাঃ সরকার?'

'সেটাই ত বলতে এলাম। তখন লোকজনের সামনে বলিনি। চাবির কথাটা ত গোলমালে ভুলেই গিয়েছিলাম; এখন কী হয়েছে জানেন ত? ডাক্তারকে জিগ্যেস করতে বললেন জয়ন্তর কাছে চাবি ছিল না। হয়ত অজ্ঞান হবার সময় হাত থেকে পড়ে গেছে।'

'আপনি খুঁজেছেন চাবি?'

'তন্ন তন্ন করে। সিঁড়ি, ল্যান্ডিং, সদর দরজার বাইরে, কোথাও বাদ দিইনি। সে চাবি হাওয়া।'

'যাকগে, ডুপলিকেট আছে ত,' বলল ফেলুদা। 'ও নিয়ে ভাববেন না।'

'তা না হয় ভাবব না,' গম্ভীরভাবে বললেন শঙ্করবাবু, 'কিন্তু রহস্য ত দূর হল না। চোর ত অজ্ঞাতই রয়ে গেল। আর আপনাকে একটা মাথা খেলানোর সুযোগ দেব ভেবেছিলাম, সেটাও হল না।'

'তাতে কী হল?' ফেলুদা বলল। 'এখানে এসে লাভ হয়েছে বিস্তর। একে এরকম বাড়ি, তার উপর আপনার আতিথেয়তা।'

শঙ্করবাবু যাবার আগে বলে গেলেন যে সকালে সাড়ে ছটায় চা দেবে, আর আটটায় ব্রেকফাস্ট।

'এটা অ্যাটেমটেড মার্ডার নয়ত মশাই?' লালমোহনবাবু ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করলেন। 'মিঃ কাঞ্জিলাল আর মিঃ ম্যাজিশিয়ান দুজনেই কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলেন।'

'মার্ডারের দরকার কী? কার্যসিদ্ধির জন্য ত শুধু অজ্ঞান করলেই চলে।'

'কার্যসিদ্ধি?'

'জয়ন্তবাবুকে অজ্ঞান করে তাঁর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে সিন্দুক খুলে যা বার করার বার করে আবার হাতে চাবি গুঁজে দিয়ে চলে আসা।'

সর্বনাশ! এটা ত খেয়াল হয়নি আমার। আমি বললাম 'তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে ত এখন তিনজনের জায়গায় সাসপেক্ট মাত্র দুজন—কাঞ্জিলাল আর কালীনাথ।'

'নারে তোপসে,' বলল ফেলুদা 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়। জয়ন্তবাবুর মাথায় কেউ বাড়ি মারলে ত সেটা তিনি জ্ঞান হলে বলতেন; তা তো বলেননি। আর অজ্ঞান করে যে সিন্দুক খুলবে সেটাই বা কি করে সম্ভব—খুড়ীমা ত ঘরে

থাকতে পারেন। একজন বাইরের লোক সিন্দুক খুলছে দেখলে কি তিনি চুপ করে থাকতেন?'

একটা আশার আলো জ্বলতে না জ্বলতে নিভে গেল। আমি শুয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু অত তাড়াতাড়ি আর ঘুমোন হল না। ফেলুদা এমনিতেও পায়চারি করছিল, বারোটা নাগাদ লালমোহনবাবু হঠাৎ আমাদের ঘরে এসে নিচু গলায় বললেন, 'বারান্দায় গেসলুম। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, মশাই—উপ্‌চে পড়ে আলো!'

'উপ্‌চে নয়, উছ্‌লে,' বলল ফেলুদা।

'সরি, উছ্‌লে। কিন্তু একবার বাইরে এসে দেখুন। এ দৃশ্য দেখবেন না কখনো।'

'আপনি একা কাব্যি করবেন, এটা হতে দেওয়া যায় না,' বলল ফেলুদা। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

বাইরে গিয়ে মনে হল এ যেন দিনের বেলার দৃশ্যের চেয়েও ঢের বেশি সুন্দর। একটা পাতলা কুয়াশা নদীর ওপারটাকে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলেছে। গঙ্গার আবছা গাঢ় জলের উপর ছড়ানো চাঁদির টুকরোগুলো ধীরে ধীরে দুলছে। তারই মধ্যে ঝিঁঝিঁর ডাক, হাস্নুহানার গন্ধ, ফুরফুরে বাতাস, সব মিলিয়ে সত্যিই অমরাবতী।

ফেলুদা ত্রয়োদশীর চাঁদটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'চাঁদের মাটিতে মানুষের পা পড়লেও, এর মজা কোনোদিন নষ্ট করতে পারবে না।'

'একটা মারাত্মক পোয়েম আছে চাঁদ নিয়ে,' বললেন লালমোহনবাবু।

'আপনার এথিনিয়াম ইন্‌স্টিটিউশনের সেই বাংলার শিক্ষকের লেখা?'

'ইয়েস। বৈকুণ্ঠ মল্লিক। এই পোড়া দেশে লোকটা রেকগনিশন পেলে না, কিন্তু আপনি শুনুন কবিতাটা। শোনো, তপেশ।'

এতক্ষণ আমরা নিচু গলায় কথা বলছিলাম। কিন্তু আবৃত্তির সময় লালমোহনবাবুর গলা আপনা থেকেই চড়ে গেল।

'আহা, দেখ চাঁদের মহিমা
কভু বা সুগোল রৌপ্যথালি
কভু আধা কভু সিকি কভু একফালি
যেন সদ্য কাটা নখ পড়ে আছে নভে—
সেটুকুও নাহি থাকে, যবে
আসে অমাবস্যা—
সেই-রাতে তুমি তাই
অচন্দ্রম্পশ্যা!

বুঝতেই পারছ, তপেশ, পদ্যটা একজন লেডিকে অ্যাড্রেস করে লেখা।'

'একজন লেডিকে ত আপনি আবৃত্তির ঠেলায় ঘর থেকে টেনে বার করেছেন দেখছি।'

ফেলুদার দৃষ্টি দোতলার বারান্দার দিকে। ওই যে খুড়ীমার ঘর। বৃদ্ধা বারান্দার দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়িয়েছেন। মিনিটখানেক এদিক ওদিক দেখে আবার ভিতরে ঢুকে গেলেন।

এর পরে আমরা ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে বসেছিলাম আধ ঘণ্টা। মনমেজাজ তাজা, রাতের খাওয়া হজম। তারপর এক সময় ফেলুদা তার হাতঘড়ির রেডিয়াম

ডায়াল চোখের সামনে ধরে বলল, 'পৌনে এক।'

আমরা তিনজনেই উঠে পড়লাম, আর তিনজনেই একসঙ্গে শুনলাম শব্দটা।

সেটা যেন আসছে বাড়ির দোতলা থেকেই।

খট্ খট্ ঠং খট্ ঠং খট্ খট্ খট্...

আমরা ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম।

'সিঁদ কাটছে নাকি মশাই?' লালমোহনবাবু ফিস্‌ফিস্ করে জিগ্যেস করলেন।

আমার দৃষ্টি আবার চলে গেল খুড়ীমার ঘরের দিকে। ঘরে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। আওয়াজটা আসছে ওই ঘর থেকেই।

খট্ খট্ খট্ খট্ ঠং ঠং...

কিন্তু ওই ঘর ছাড়াও আরেকটা ঘরে আলো জ্বলছে। দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটা। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একজন লোক দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে।

এবার লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'মিঃ কাঞ্জিলাল,' বলল ফেলুদা। 'ওটাই শঙ্করবাবুর ঘর।'

'এই মাঝরাত্তিরে কী আলোচনা মশাই?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'জানি না,' বলল ফেলুদা। 'ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু হবে।'

'আপনাদেরও ঘুম আসছে না?'

নতুন গলা পেয়ে চমকে উঠে দেখি ম্যাজিশিয়ান কালীনাথবাবু।

ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। খট্ খট্ শব্দটা এখনো হয়ে চলেছে। কালীনাথবাবুর ঘাড় ঘুরে গেল সেই দিকে।

'কিসের শব্দ বুঝতে পারছেন ত?' প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'হামানদিস্তা কি?' ফেলুদা বলল।

'ঠিক বলেছেন। এই মাঝরাত্তিরে বুড়ি পান ছাঁচতে বসেন। এ শব্দ আগেও পেয়েছি।'

কথাটা বলে হাতের তেলোর আড়ালে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ফেলুদার দিকে একটা সেয়ানা দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'বনোয়ারিলালের জীবনী লেখার জন্য গোয়েন্দার দরকার হল কেন?'

আমি ত থ'! লালমোহনবাবুরও মুখ হাঁ হয়ে গেছে। ফেলুদা একটু হালকা হেসে বলল, 'যাক্, অন্তত একজন আমার আসল পরিচয়টা জানে দেখে ভালোই লাগল।'

'তা জানবে না কেন মিঃ মিত্তির? এ শর্মা অনেক ঘাটের জল খেয়েছে। অনেক কিছু দেখে শুনে চোখ কান দুইই খুলে গেছে।'

ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে। তারপর বলল, 'আপনি কি রহস্যই করবেন, না খুলে বলবেন?'

'খুলে আর কজনে বলতে পারে মিঃ মিত্তির? স্পষ্টবক্তা আর কজনে হয়? বেশির ভাগই ত মুখচোরা। আর দুঃখের বিষয়, আমিও যে সেই দলেই পড়ি। আপনি গোয়েন্দা, খুলে বলার কাজ হল আপনার। তবে আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। এখানে এসে আপনার পেশাটাকে কাজে লাগানোর কথা ভুলে যান। অমরাবতীতে এসেছেন, দুদিন ফুর্তি করে গঙ্গার হাওয়া খেয়ে ফিরে যান। নইলে বিপদে পড়তে পারেন।'

'আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।'

কালীনাথবাবু নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

'লোকটা অনেক কিছু জানে বলে মনে হচ্ছে?' চাপা গলায় বললেন লালমোহনবাবু।

'একটা জিনিস ত জানতেই পারে,' বলল ফেলুদা।

'কী?' আমরা দুজনে একসঙ্গে জিগ্যেস করলাম।

'চুরিটা কে করেছিল। যে করেছিল সে তো ওঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু সেটা ত উনি নিজেও করে থাকতে পারেন। উনি ত হাত সাফাই জানেন।'

'এগজ্যাক্টলি,' বলল ফেলুদা।

॥ ৪ ॥

সাড়ে ছটায় বেড টি না দিলে হয়ত ঘুম ভাঙতে আরো দেরি হত, কিন্তু ফেলুদাকে দেখে মনে হল সে অনেকক্ষণ আগেই উঠেছে। জিগ্যেস করাতে বলল, 'শুধু উঠেছি নয়, এর মধ্যে একটা চক্করও মেরে এসেছি।'

'কোথায়?'

'শহরের দিকে।'

'কী দেখলে?'

'কী দেখলাম না সেটাই বড় কথা।'

'কিছু বুঝতে পারলে?'

'পানিহাটিতে আসা বৃথা হয়নি এটা বুঝেছি।'

লালমোহনবাবু এসে বললেন এমন সলিড ঘুম নাকি ওঁর অনেকদিন হয়নি।

'খুড়ীমার উঠতে দেরি দেখে তিনিও খুব সলিড ঘুমিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে,' বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, 'সেটা আবার কি করে জানলে?'

'অনন্তকে জিগ্যেস করেছিলাম। সে বলল মা-ঠাকরুণ এখনো গঙ্গাস্নানে যাননি। এমনিতে ছটার মধ্যে নাকি ওঁর স্নান সারা হয়ে যায়।'

আমরা তিনজন বারান্দায় গিয়ে বসেছিলাম, মিনিট দশেকের মধ্যে শংকরবাবু এসে পড়লেন। স্নান-টান সেরে ফিটফাট।

'আমি কিন্তু ধরা পড়ে গেছি, মিঃ চৌধুরী,' বলল ফেলুদা। 'আপনার বাল্য-বন্ধু আমায় চিনে ফেলেছেন।'

'সে কি!'

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন। ভদ্রলোক গভীর জলের মাছ।'

'তাহলে কি বলছেন আপনার পরিচয়টা দিয়েই দেব?'

'তাহলে কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার জানিয়ে দিতে হবে আপনি কেন আমাকে ডেকেছেন। অর্থাৎ এতদিন যে কথাটা চেপে রেখেছিলেন সেটা প্রকাশ করতে হবে।'

শংকরবাবুর কপালে আবার দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাঞ্জিলাল আর কালীনাথবাবু বারান্দায় এসে পড়লেন, আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। কাঞ্জিলাল আর কালীনাথ বারান্দায় রয়ে গেলেন, আমরা চারজন সদর দরজায় গিয়ে হাজির

হলাম।

লাল ক্রস-মারা একটা কালো অ্যামবাসাডর থেকে নামলেন জয়ন্তবাবু আর ডাঃ সরকার। জয়ন্তবাবুর মাথার পিছনের চুল খানিকটা কামিয়ে সেখানে প্লাস্টার লাগানো হয়েছে।

জয়ন্তবাবু নেমেই তাঁর দাদার কাছে ক্ষমা চাইলেন।—'ভেরি সরি। তোমার জন্মতিথিতে এমন একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেললাম। আসলে প্রেশারটা...'

'কোনো চিন্তা নেই,' বললেন ডাঃ সরকার। 'আমি ওষুধ দিয়ে দিয়েছি। তবে রোদে বেশি ঘোরাঘুরি চলবে না।'

'আপনারা চা খাবেন ত?' বললেন শঙ্করবাবু।

'তা হলে মন্দ হত না। চা-পানের সময় পাইনি এখনো।'

'এরা সব কোথায়?' জয়ন্তবাবু জিগ্যেস করলেন।

'বারান্দায়,' বললেন শঙ্করবাবু।

জয়ন্তবাবু আর ডাঃ সরকার বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

'চলুন, সকলে একসঙ্গেই বসা যাক,' ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন শঙ্করবাবু।

'দাঁড়ান, আগে একটা কাজ সেরে নেওয়া দরকার।'

ফেলুদা কথাটা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল। কী কাজের কথা বলছে ও?

'কাজ?' শঙ্করবাবু একটু যেন অবাক হয়েই জিগ্যেস করলেন।

'আপনার খুড়ীমার কাছে সিন্দুকের যে ডুপ্লিকেট চাবিটা আছে সেটা চাইলে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।'

'তা নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু—'

'একবার সিন্দুকটা খুলে দেখতে চাই।'

খুড়ীমার ঘরে গিয়ে দেখি বুড়ি গামছা নিয়ে স্নানে বেরোচ্ছেন।

'আজ তোমার এত দেরি?' শঙ্করবাবু প্রশ্ন করলেন।

'আর বলিস না। চোখ মেলে দেখি ঝাঁ ঝাঁ রোদ। একেকদিন কী যে হয়!'

'তোমার চাবিগোছাটা একবার দিতে হবে খুড়ীমা। সিন্দুকটা খুলব।'

'কিন্তু তোর কাছে যে—?'

'আমারটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

খুড়ীমা আলমারি খুলে চাবির গোছা বার করে দিয়ে চলে গেলেন।

শঙ্করবাবু সিন্দুকের দিকে এগিয়ে গেলেন, আর সেই ফাঁকে কেন জানি ফেলুদা হামানদিস্তাটা হাতে নিয়ে একবার নেড়েচেড়ে দেখল।

'সর্বনাশ!'

শঙ্করবাবুর চিৎকারে চমকে লালমোহনবাবু সেলিম আলির বইটা তাঁর হাত থেকে ফেলেই দিলেন।

'খালি বাক্স কিছুই নেই,' বলল ফেলুদা।

শঙ্করবাবুর ফ্যাকাসে মুখ দিয়ে কথাই বেরোচ্ছে না।

'ওটা বন্ধ করুন,' বলল ফেলুদা। 'তারপর চলুন নিচে যাওয়া যাক। সত্য উদ্ঘাটনের সময় এসেছে। আমার আসল পরিচয়টা সকলকে জানিয়ে দিন এবং কতকগুলো প্রশ্ন করব সেটাও জানিয়ে দিন।'

বুঝতে পারছি শঙ্করবাবুকে অনেকখানি মনের জোর প্রয়োগ করতে হচ্ছে, কিন্তু তিনি গত বছরের চুরির ব্যাপারটা, আর আজ এইমাত্র সিন্দুক খুলে যা



দেখলেন সেটা মোটামুটি গুছিয়ে সকলকে বলে বললেন, 'আমার বাড়িতে আমারই অতিথি হয়ে এসে আমার এত কাছের লোক যে এমন একটা কাজ করতে পারে সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু ঘটনা যে ঘটেছে তাতে কোনো ভুল নেই, আর সেই কারণেই আমি কলকাতার স্বনামধন্য ইনভেস্টিগেটর প্রদোষ মিত্রকে ডেকেছি এর কিনারা করার জন্য। ইনি তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। আশা করি তোমরা তার ঠিক ঠিক জবাব দেবে।'

সকলে চুপ। কার মনে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দেখে বোঝার উপায় নেই।

ফেলুদা শুরু করল। প্রথম প্রশ্নটা ডাঃ সরকারকে, আর সেটা যাকে বলে অপ্রত্যাশিত।

'ডাঃ সরকার, আপনাদের এই পানিহাটিতে কটা হাসপাতাল আছে?'

'একটাই,' বললেন ডাঃ সরকার।

'তার মানে সেখানেই আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন জয়ন্তবাবুকে, আর সেখান

থেকেই কাল রাত্রে ফোন করেছিলেন?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন জানতে পারি কি?'

'কারণ আজ সকালে আমি সে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, জয়ন্তবাবু সেখানে যাননি।'

ডাঃ সরকার হাসলেন।

'কাল রাত্রে যে আমি হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলাম সে কথা ত আমি শঙ্করবাবুকে বলিনি।'

'তবে কোত্থেকে করছিলেন?'

'আমার বাড়ি থেকে। কাল যাবার পথেই জয়ন্তবাবুর জ্ঞান হয়। তখন বুঝতে পারি আঘাত গুরুতর নয়, কনকাশন হয়নি। তবু একবার দেখব বলে আমার বাড়িতেই নিয়ে যাই। তখনই ঠিক করি রাত্তিরটা ওখানে রেখে সকালে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

'এবার জয়ন্তবাবুকে একটা প্রশ্ন,' বলল ফেলুদা। 'আপনি কাল যে সিন্দুক খোলার জন্য চাবিটা নিলেন, সেটা ত আপনার হাতেই ছিল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ার পর আর হাতে নাও থাকতে পারে।'

'হাতে না থাকলেও, কাছাকাছিই পড়ে থাকার কথা। কিন্তু তা ত ছিল না।'

'সেটার আমি কি জানি? চাবি আপনারা খুঁজে পেলেন কি না পেলেন তার আমি কী করতে পারি? আপনি কী বলতে চাইছেন সেটা সরাসরি বলুন না।'

'আরেকটা প্রশ্ন আছে, সেটাও ডাক্তারকে। তার পরেই সরাসরি বলছি। ডাঃ সরকার, হিমোগ্লোবিন বলে একটা পদার্থ আছে সেটা আপনি জানেন নিশ্চয়ই।'

'কেন জানব না?'

'সাধারণ লোকের চোখে সেটার রঙের সঙ্গে রক্তের কোনো তফাত ধরা পড়ে না সেটাও নিশ্চয়ই জানেন।'

ডাক্তার সরকার গলা খাক্‌রানি দিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে দিলেন।

'আমার বিশ্বাসটা কী তাহলে এবার বলি?' বলল ফেলুদা। সকলে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে। 'আমার বিশ্বাস জয়ন্তবাবু অজ্ঞান হননি, অজ্ঞান হবার ভান করেছিলেন—ডাক্তার সরকারের সঙ্গে একজোট হয়ে। কারণ তাঁদের দুজনের এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার দরকার ছিল।'

'ননসেন্স!' চেঁচিয়ে উঠলেন জয়ন্তবাবু। 'কেন, চলে যাব কেন?'

'কারণ মাঝরাত্তিরে গোপনে আবার ফিরে আসবেন বলে।'

'ফিরে আসব?'

'হ্যাঁ। উত্তরের ফটক দিয়ে ঢুকে, পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আপনার মার ঘরে যাবেন বলে।'

'আপনি একটু বাড়াবাড়ি করছেন, মিঃ মিত্তির। মাঝ রাত্তিরে মা-র ঘরে যাব, আর মা টের পাবেন না? মা রাত্তিরে তিনঘণ্টার বেশি ঘুমোন না সেটা আপনি জানেন?'

'এমনিতে ঘুমোন না—কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়ালে? ধরুন যদি ডাক্তারবাবু গতকাল তাঁকে দেখার সময় তাঁর দুধভাতে কিছু মিশিয়ে দিয়ে থাকেন?'

জয়ন্তবাবু আর ডাঃ সরকার দুজনেরই ডোন্ট-কেয়ার ভাবটা মিনিটে মিনিটে কমে আসছে সেটা বুঝতে পারছি। ফেলুদা বলে চলল, 'আপনার ফিরে আসতে হয়েছিল কারণ এক বছর আগে যে কাঁচা কাজটা করেছিলেন, এবার আর সেরকম

করলে চলত না। শঙ্করবাবুর পুরো প্ল্যানটাই ভেস্তে দিয়ে মাঝরাত্তিরে এসে চুরিটা সারার দরকার ছিল। সে চুরি ধরা পড়ত কবে তার কোনো ঠিক নেই। অবিশ্যি চাবি আপনার কাছে ছিল না, তাই আপনার মা-র আলমারি থেকে ডুপলিকেট বার করে নিতে হয়েছিল। সেই সময় আমার এই বন্ধুর আবৃত্তি শুনে আপনি কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই গায়ে একটা থান জড়িয়ে দরজার মুখে এসে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে আপনার মা জেগেই আছেন, এভরিথিং ইজ অল রাইট। তার পরে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করার জন্য হামানদিস্তা পিটতে শুরু করেন। এতেও আমার সন্দেহ হয়েছিল, কারণ হামানদিস্তায় পান থাকলে শব্দটা হয় একটু অন্যরকম; এটা ছিল ফাঁকা শব্দ।'

'সবই বুঝলাম, মিঃ মিত্তির,' বললেন জয়ন্তবাবু, 'কিন্তু তারপর?'

'তারপর চাবি দিয়ে সিন্দুক খোলা।'

'আপনি কোন্ অপরাধে আমাদের অভিযুক্ত করছেন, মিঃ মিত্তির? অজ্ঞান হবার ভান করা? আমার মাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া? রাত্তিরে ফিরে এসে ডুপলিকেট চাবি বার করে সিন্দুক খোলা?'

'তার মানে এর সবগুলোই করেছেন বলে স্বীকার করছেন ত?'

'এর কোনোটার জন্য শাস্তি হয় না সেটা আপনি জানেন? আসল ব্যাপারটায় আসছেন না কেন আপনি?'

'ঘটনা যে দুটো জয়ন্তবাবু, একটা ত নয়। আগে প্রথম ঘটনাটা সেরে নিই—এক বছর আগের চুরি।'

'সেটা আপনি সারবেন কি করে, মিঃ মিত্তির? আপনি কি অন্তর্যামী? আপনি তখন কোথায়?'

'আমি ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু অন্য লোক ত ছিল। যিনি চুরি করেছিলেন তাঁর ঠিক পাশেই লোক ছিল। তাদের মধ্যে অন্তত একজন কি টের পেয়ে থাকতে পারেন না?'

এবারে শঙ্করবাবু কথা বললেন। তিনি বেশ উত্তেজিত।

'এটা আপনি কী বলছেন, মিঃ মিত্তির? চুরি হয়েছে সেটা জানবে অথচ আমায় বলবে না, আমার এত কাছের লোক হয়ে?'

ফেলুদা এবার ম্যাজিশিয়ান কালীনাথবাবুর দিকে ঘুরল।

'আপনি কাল রাত্তিরে কী বিপদের কথা ভেবে আমাকে তদন্ত বন্ধ করতে বলছিলেন সেটা বলবেন, কালীনাথবাবু?'

কালীনাথবাবু হেসে বললেন, 'অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করায় বিপদ নেই? শঙ্করের মনের অবস্থাটা ভেবে দেখুন ত!'

'না, নেই বিপদ,' দৃঢ়স্বরে বললেন শঙ্করবাবু! 'অনেকদিন ব্যাপারটা ধামা চাপা রয়েছে। এবার প্রকাশ হওয়াই ভালো। তুমি যদি কিছু জেনে থাক ত বলে ফেল, কালীনাথ।'

'সেটা বোধহয় ওঁর পক্ষে সহজ নয়, মিঃ চৌধুরী,' বলল ফেলুদা, 'কারণ তদন্তে চোর ধরা পড়লে যে ওঁরও বিপদ হত। এই একটা বছর যে উনি চোরকে নিংড়ে শেষ করেছেন!'

'ব্ল্যাকমেল!'

'ব্ল্যাকমেল, শঙ্করবাবু। সেটা উনিও স্বীকার করবেন না, চোরও স্বীকার করবেন না। অবিশ্যি চোরের যে দোসর আছে সেটা সম্ভবত কালীনাথবাবু

জানতেন না, উনি একজনকেই লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা এই অনবরত ব্ল্যাকমেলিং-এর ঠেলায় দ্বিতীয় চুরিটার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আর তাই—'

'ভুল! ভুল!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন জয়ন্তবাবু। 'সিন্দুক থেকে যা নেবার তা আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। বনোয়ারিলালের আর একটি জিনিসও তাতে নেই! সিন্দুক খালি!'

'তার মানে আমার বাকি অভিযোগ সবই সত্যিই?'

'কিন্তু...কাল রাত্তিরে কুকীর্তিটা কে করেছে সেটা বলছেন না কেন?'

'সেটাও বলছি, কিন্তু তার আগে আপনার স্পষ্ট স্বীকারোক্তিটা চাই। আপনি বলুন জয়ন্তবাবু—ডাঃ সরকার আর আপনি মিলে গতবছর বারোটার মধ্যে থেকে একটি স্বর্ণমুদ্রা সরিয়েছিলেন কিনা।'

জয়ন্তবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেছে; ডাঃ সরকার দুহাতে বগ টিপে বসে আছেন।

'আমি স্বীকার করছি,' বললেন জয়ন্তবাবু। ফেলুদা পকেট থেকে টেপ রেকর্ডারটা বার করে চালু করে আমার হাতে দিয়ে দিল।

'আমি দাদার কাছে ক্ষমা চাইছি। সে স্বর্ণমুদ্রা ডাঃ সরকারের কাছেই আছে, সেটা ফেরত দেওয়া হবে। আমাদের দুজনেরই অর্থাভাব হয়েছিল। একটার জায়গায় বারোটার পুরো সেটটা বিক্রী করলে প্রায় একশো গুণ বেশি দাম পাওয়া যাচ্ছিল, তাই...'

'তাই বাকি এগারোটা নেবার কথা ভাবছিলেন।'

'স্বীকার করছি, কিন্তু চোর আরো আছে মিঃ মিত্তির। যে লোক ব্ল্যাকমেল করতে পারে—'

'-সে লোক চুরিও করতে পারে' বলল ফেলুদা। 'কিন্তু তিনি চুরি করেননি।'

'তাহলে?' প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'ওগুলো সরিয়েছেন প্রদোষ মিত্র।'

ফেলুদা ঘর থেকে বাকি মাল এনে টেবিলের উপর রাখল। সকলের মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'এই হল বনোয়ারিলালের বাকি সম্পত্তি, বলল ফেলুদা, 'মেঝেতে চাবি না পেয়ে, এবং রক্তের বদলে হিমোগ্লোবিন দেখে মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই যখন আপনাকে ধরাধরি করে নিচে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে পিকপকেটের ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে চাবিটা ছিল আপনার প্যান্টের ডান পকেটে। বাঁ পকেটে থাকলে পেতাম না। আপনাকে নিয়ে যাবার পর আমরা বৈঠকখানায় এসে বসি। তখনই এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে আমি সিন্দুক খুলে জিনিসগুলো বার করে আমার ঘরে রেখে দিই। আমি জানতাম যে বিপদের আশঙ্কা আছে।- এই নিন আপনার চাবি, মিঃ চৌধুরী। এরপর কী করা হবে সেটা আপনিই স্থির করুন; আমার কাজ এখানেই শেষ।'

ফেরার পথে লালমোহনবাবুর মুখে আরেকটা আবৃত্তি শুনতে হল। এটাও বৈকুণ্ঠ মল্লিকের লেখা। নাম হল 'জিনিয়াস'—

'অবাক প্রতিভা কিছু জন্মেছে এ ভবে
এদের মগজে কী যে ছিল তা কে কবে?
দা ভিঞ্চি আইনস্টাইন খনা লীলাবতী
সবারেই স্মরি আমি, সবারে প্রণতি।'